শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিরাময়ানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৩

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ—১৩৬০

মুদ্রাকর
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—তৃতীয় ভাগ" প্রকাশিত হচ্ছে। পূর্বপ্রকাশিত দুটি ভাগের আশাতীত সমাদর আমাদের তৃতীয় ভাগ প্রকাশনে আগ্রহী করেছে। এই ভাগের রচনা ও ব্যাখ্যারীতি পূর্ববৎ। "কথামৃতে"র প্রথম ভাগের আলোচনার পর দ্বিতীয় ভাগের অল্পাংশ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতি ও অন্যান্য কাজে স্নেহভাজন অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরুণকুমার মিত্র আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন। উদ্বোধনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ বহুপ্রকার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও যত্নসহকারে পাণ্ডুলিপি সংশোধন ক'রে দিয়েছেন।

আশা করি, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মতো এই ভাগটিও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

গুরুপূর্ণিমা ১৩৬০

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

এক

কথামৃত—১।১৫।২

ইন্দ্রিয়ের মোড় ফিরানো

জ্ঞান কার কার হয় না. এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, বিদ্যা পাণ্ডিত্য ও ধনের অহংকার থাকলে জ্ঞান হয় না! অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এইসব অহংকার ছাড়তে হবে। অহংকার বিভিন্ন গুণ থেকে হয়, এটা বোঝাবার জন্য বলছেন, "তমোগুণের স্বভাব অহংকার। অহংকার অজ্ঞান থেকে হয়।" রজো-গুণের আরও দুটি লক্ষণ কামক্রোধাদি। গীতায় আছে—কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। ঠাকুর তমঃ ও রজঃকে পৃথক না ক'রে আরো একটু ব্যাপক অর্থে বলছেন, দুই-ই মানুষকে বদ্ধ করে, আর সত্ত্বগুণ মুক্ত করে। "ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না; হনুমান লঙ্কা পোড়ালেন, এ-জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে!" ক্রোধে যে আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, তা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি। বলি, 'আমি তখন' রেগে গিয়েছিলাম, জ্ঞান ছিল না'। শ্রীভগবান গীতায় বলছেন:

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥—২।৬২-৬৩

এটি পর পর হয়। প্রথম বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ। বিষয়ের মধ্যে

থাকা, বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ক্রমশঃ বিষয়কে ভাল লাগে, তার জন্য মনে বাসনা জাগে। তারপর সেই কাম বা ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক যা কিছু, তার উপরই ক্রোধ হয়—সুতরাং কাম থেকে ক্রোধ। ক্রোধ থেকে মোহ বা হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা; মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ—আত্মজ্ঞান বা নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে যে স্মৃতি তা বিনষ্ট হয়। স্মৃতিভ্রংশ হ'লে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধি বলতে 'নিশ্চয় করার শক্তি'। এই পথে চ'লব, এই আমার লক্ষ্য—এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নাশ হয়। আর বুদ্ধি নাশ হ'লে মানুষের রইল কি? মানুষই বিনষ্ট হ'ল।

এখানে লক্ষণীয় ঠাকুর কাম ও ক্রোধ দুটিকে আলাদা ক'রে বলেননি। যা একরূপে কাম বা বাসনারূপে দেখি, ঠিক সেই বস্তুই আর একরূপে—ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। এখন এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে, কামক্রোধাদি রিপুগুলি যে মানুষের আছে, তাদের জয় করবার উপায় কি? ঠাকুর বলছেন, "পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম-ক্রোধাদি রিপু—এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও।" কাম—'প্রাপ্তির ইচ্ছা' ঈশ্বরের প্রতি হ'ক। ক্রোধ—ঈশ্বরপ্রাপ্তির অন্তরায়গুলির প্রতি ক্রোধ হ'ক। লোভ—ভগবানের প্রতি লোভ হ'ক। মোহ—তাঁর রূপে ও গুণের প্রতি আকর্ষণ হ'ক। তারপর মদমাৎসর্যাদি এদের থেকেই আসছে। ভগবানকে নিয়ে মত্ত হও, তাঁকে নিয়ে অভিমান, অহংকার কর। এইভাবে রিপুগুলি ভগবানের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার ফলে তাদের অনিষ্টকারিতা দূর হ'য়ে যায়। বিশেষ ক'রে সংসারে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ, তার মোড় ভগবানের দিকে ফেরাতে পারলে তা আমাদের ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। অবশ্য কাজটি যত সহজ মনে হচ্ছে, তত সহজ নয়। কিন্তু অভ্যাসের এ একটি প্রণালী। ঠাকুর বার বার অনেক প্রসঙ্গে এই

প্রণালীর উপর জোর দিয়েছেন, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রণালীটি খুব প্রয়োজনীয়।

প্রায়ই কোন ব্যক্তি বা স্নেহের পাত্রের উপর আমরা আকর্ষণ বোধ করি—যার চরম দৃষ্টান্ত ভরত রাজার হরিণ ভাবার কথা। আমরাও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে, সমস্ত মনটা তাতে কেন্দ্রীভূত ক'রে, বদ্ধ হ'য়ে যাই। এর প্রতিকার কি? ঠাকুরের কথা এই যে, তার ভিতর ঈশ্বরকে দেখবার চেষ্টা কর। যেমন জনৈকা বিধবা স্ত্রীভক্তকে ঠাকুর ধ্যানজপ কেমন হচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'ধ্যান করতে বসলে এর মুখ, তার কথা মনে পড়ে।' ও রকম ভাসা-ভাসা উত্তরে ঠাকুর নিবৃত্ত হলেন না; বললেন, 'কার কথা মনে পড়ে?' ভক্তের উত্তর, আমার একটি ভাইপোকে মানুষ করছি, তাব কথা মনে পড়ে, আকর্ষণ তারই উপর। ঠাকুর বললেন, তাকেই গোপাল ভাববে। তাকে মানুষ ভেবে ভালবাসতে, এখন গোপাল ভেবে ভালবাসবে। বললেন না—তার দিক থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে ভগবানের দিকে দিতে চেষ্টা কর, বৈরাগ্য অবলম্বন কর, সাধন কর। ঠাকুরের সেই উপদেশ অবলম্বন ক'রে ভক্তটির অল্পদিনের মধ্যেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি এত গভীর হ'ল যে ভাবসমাধি পর্যন্ত হ'য়ে যেত। এই প্রণালী। ভক্তটিকে 'ভাইপোর কথা আর ভেব না' বললে তার পক্ষে তা মানা অসম্ভব হ'ত। আমাদের মনের প্রবণতা যেদিকে হঠাৎ লাগাম ক'ষে তাকে সেদিক থেকে আটকাতে গেলে সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে আমাদের পরাস্ত করার জন্য, যেমন প্রবহমান নদীস্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকাতে গেলে সে তার সর্বশক্তি দিয়ে বাঁধ ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি খাল কেটে তার গতিপথকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করা যায়, তা হ'লে প্রবাহ যে পথে নিয়ে যাচ্ছে, নদী সেদিকেই চলবে। ঠিক তেমনি জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তির উপর মনের আকর্ষণ থাকলে, সেই বস্তু বা ব্যক্তির

ভিতর ভগবানের অস্তিত্ব ভাবনা করতে করতে বস্তুধর্ম অনুসারে মন শুদ্ধ হ'য়ে যাবে। আকর্ষণ তখন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি না হ'য়ে, ভগবানের প্রতি হবে। এই হ'ল কৌশল।

গীতায় যেমন বলা হয়েছে, যে-কর্ম বন্ধনের কারণ, কৌশলপূর্বক অনুষ্ঠান করলে সেই কর্মই আমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। তেমনি যে-ভালবাসা আমাদের বদ্ধ করে, কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করলে তা মুক্ত করে। সেই কৌশলটিকে ঠাকুর এখানে শিখিয়ে দিচ্ছেন। এতে নিজের মনের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করার দরকার হয় না। সে-যুদ্ধে হয়তো অনর্থক শক্তি ক্ষয় হ'ত, কিন্তু কখন মনকে জয় করা যেত না। কিন্তু এই কৌশল অভ্যাস করতে করতে, ছেলেটিকে গোপাল ব'লে ভাবতে ভাবতে অনায়াসে মন ঐ পাত্রের ভিতর যে-মনুষ্য ভাব আছে, সেটা বিস্মৃত হ'য়ে সেখানে গোপালের উপস্থিতি দেখতে লাগল।

মানুষের মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন সে গাছ-পাথর হ'য়ে যায় না, বা তার মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ম'রে যায় না। সেগুলি তখন ভগবদ্মুখী হ'য়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, যে বস্তু আকর্ষণ করছে, তার ভিতর ভগবানকে ভাবতে চেষ্টা করতে, জ্ঞানপূর্বক এই কৌশল অবলম্বন করতে। শাস্ত্র বলছেন, জড় বস্তু মনকে আকর্ষণ করে না। তার ভিতর যে চিৎসত্তা, ভগবৎসত্তা আছে, যে আনন্দস্বরূপ-রূপে তিনি রয়েছেন, তাতেই আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সে আকর্ষণ যে তাঁর, তা না বুঝে জড়ের যে আবরণ রয়েছে তার আকর্ষণ ব'লে মনে করি, সুতরাং বদ্ধ হই। কিন্তু আকর্ষণের বস্তুকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখলে আর তা বন্ধনের কারণ হয় না। এর দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি, যে সব দৃশ্য দেখে সাধারণের মনে কোন নীচ ভাবের উদয় হয়, ঠাকুর তা দেখে ভগবদানন্দে বিভোর হ'য়ে যাচ্ছেন কেন? মাতালের মত্ততা কি কারো মনে ধর্মভাবের উদ্রেক করে? কিন্তু মদ খেয়েই হ'ক, বা

যে করেই হ'ক, আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে। সে আনন্দানুভূতি ঠাকুরের মনে পরমানন্দের অনুভূতি এনে দিচ্ছে, তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে যাচ্ছেন।

এ-রকম আরো অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে তীব্র বিষয়সুখ মানুষকে আকর্ষণ করে, ঠাকুরের কাছে সেখানে বিষয় নেই, আছেন তিনি। বিষয়-আনন্দ ভগবদ্-আনন্দেরই ক্ষুদ্র অংশ। আলোর উপর আবরণ থাকলে খানিকটা আলো যেমন আবরণ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে, তেমনি ব্রহ্মানন্দের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বিষয়রূপ আবরণ ভেদ ক'রে আসছে, আর আমরা আকৃষ্ট হচ্ছি। তাই ঠাকুর বার বার বলছেন, বিষয়ের প্রতি ভালবাসা বন্ধ করে, তা তাঁর উপর আরোপ কর। এর নাম মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। এইভাবে রিপুদের মোড় ফিরিয়ে বস্তুর স্বরূপকে অনুভব করবার চেষ্টা করতে করতে বিষয় অদৃশ্য হ'য়ে সেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর প্রকাশিত হবেন; তাঁরই আকর্ষণ বোধ হবে। সাধনের এটি বিশেষ অঙ্গ, বিশেষতঃ ভক্তিপথের এটি একটি উপায়।

উপায়টি ভক্তিশাস্ত্রে এইভাবে অনুসৃত হয়েছে। মাটি পাথর বা কাঠের একটি মূর্তি ক'রে আমরা ভাবতে লাগলাম এটি পরমেশ্বর—এ তাঁরই মূর্তি, এর ভিতর আমরা তাঁকেই চিন্তা ক'রব। মূর্তিটি আমাদের প্রত্যক্ষ, সেটিকে সাজাতে গোছাতে নাড়া-চাড়া করতে পারি। ঈশ্বরকে তো ধরতে ছুঁতে পারছি না। যদিও বিচারের দৃষ্টিতে দেখলে আমরা পরিষ্কার বুঝি মূর্তিটি ঈশ্বর নয়, কোন ভাস্কর বা শিল্পীর গড়া। কিন্তু তবু শাস্ত্রের নির্দেশ, 'ওখানে ঈশ্বরবুদ্ধি কর।' মূর্তিটিকে সাজাচ্ছি, গোছাচ্ছি, তাঁর উপর আমার ভালবাসা অর্পণ করছি—এই করতে করতে মূর্তির ভিতর তিনি আবির্ভূত হবেন। এই হ'ল মোড় ফেরানো। আমরা বলি, সাধনার দ্বারা দেবতা জাগ্রত হন, কিংবা

অমুক জায়গায় দেবতা জাগ্রত। তার মানে কি দেবতা ঘুমিয়ে আছেন? ধাক্কা দিয়ে তাঁকে জাগাতে হবে? তা নয়। আমার কাছে তিনি নিদ্রিত। অর্থাৎ আমি নিজে জাগ্রত নই, সচেতন নই যে তিনি আছেন। কেবল আরোপ ক'রে যাচ্ছি—তিনি আছেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন। এইরকম ভাবতে ভাবতে ভালবাসা প্রথমে স্থূলরূপের দিকে গেল। পরে মৃন্ময়রূপ চিন্তা করতে করতে সেখানে চিন্ময়রূপ ফুটে উঠল। সাধনার পরিণতি এইখানে। পূজা করবার সময় পূজাবিধি অনুসারে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কোথা থেকে আসে এই প্রাণ? আসে নিজের প্রাণ থেকে। কল্পনা করি, আমার হৃদয় থেকে দেবতা এসে মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

প্রতীক উপাসনা

ভাব হচ্ছে এই যে, দেবতা হৃদয়েই; কিন্তু সেখানে রেখেই পরিপূর্ণভাবে পূজা করতে পারছি না, মন সেখানে স্থির হচ্ছে না। আমরা সকলেই চেষ্টা করি এবং বুঝতে পারি হৃদয়ে তাঁকে ভাবা কত কঠিন। কাজেই একটি অবলম্বন দরকার, মনটি যেখানে একাগ্র হ'তে পারে। মূর্তিটি সেই বাহ্য অবলম্বন। পূজার পাত্র সেটি নয়, বাহ্য পূজার পাত্র তাঁর প্রতীক। সেটিকে যখন পূজার্চনা করি, তখন আমাদের মন ক্রমশঃ সেই স্থূল বস্তুটিকে আশ্রয় ক'রে চিন্ময় সত্তায় যাবার চেষ্টা করছে। করতে করতে সেখানে ভগবৎসত্তা প্রকাশিত হবে। এই প্রকাশই মনের লক্ষ্য। সেইরকম ঠাকুর ভক্তটিকে বললেন, ভাইপোতে গোপালের সত্তা আরোপ ক'রে ভালবাসা অর্পণ করতে। ঠাকুরই বলেছেন, কাঠ-পাথরে ভগবানের পূজা হয়, আর মানুষে হয় না? মানুষের ভিতরেও হয়। এইজন্যই ৺দুর্গাপূজার সময় কুমারী পূজা করা হয়।

একটি বালিকা, দশটা হাত নেই, সিংহবাহিনীও নয়, কিন্তু তার মধ্যে দশভূজার আবির্ভাব কল্পনা ক'রে পূজা করা হয়। কারণ যতক্ষণ মনটা স্থূল, ততক্ষণ একটা স্থূল আশ্রয় বা আধারের প্রয়োজন হয়। স্থূল মন যাকে ধরতে বুঝতে পারে এবং সেই অবলম্বনকে নিয়ে মনকে ক্রমশঃ একাগ্র করতে পারে।

শুধু মূর্তি নয়, শব্দও প্রতীক হয়। যখন 'ওঁ'-কারকে ভগবানের প্রতীক ব'লে উপাসনা করি, সেখানে শব্দটি ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মস্বরূপ কল্পনা ক'রে উপাসনা করি। তেমনি ভগবানের ধ্যান করবার সময় তাঁর যে মনোময়ী মূর্তি চিন্তা করি, সেও প্রতীক। সাক্ষাৎ তিনি হ'লে এত প্রয়াস ক'রে অভিনিবেশের দরকার হ'ত না। এইরকম তাঁর বহু প্রকার প্রতিমা বা প্রতীক হ'তে পারে, যেগুলিকে অবলম্বন ক'রে তাঁরই চিন্তা করি, প্রতীকগুলিকে আলাদা ক'রে চিন্তা করি না। বিষয়াসক্ত মনকে কোন একটি প্রতীকে কেন্দ্রিত করলে ক্রমে মনের স্থিরতা আসে ও ভক্তিলাভ হয়। ভাগবতে এজন্য বিগ্রহোপাসনাকে সাধনার প্রথম স্তর বলা হয়েছে। সেখানে যে ত্রিবিধ ভক্তের কথা বলা আছে, তাদের মধ্যে মূর্তিপূজক হ'লেন প্রাকৃত ভক্ত।

সাধারণ মানুষের ভক্তিলাভের জন্য প্রতীকের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য দেশে বক্তৃতায় বলেন: পুতুল-পূজা করি ব'লে তোমরা আমাদের উপহাস কর, আর ব'লো, আমরা ঈশ্বরের পূজা করি। 'ঈশ্বর' বললে এই শব্দটি ছাড়া আর কি তোমাদের মনে ওঠে? এই শব্দটি তো একটি প্রতীক, যাকে অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরের পূজা ক'রছ এবং যে প্রতীক ছাড়া ঈশ্বর-স্বরূপকে চিন্তা করতে পারছ না। কখনো 'ঈশ্বর' শব্দটিকে, কখনো চার্চে অবস্থিত মূর্তিকে বা ক্রশচিহ্নকে চিন্তা কর। সবই তো প্রতীক—যা মনকে কেন্দ্রিত করবার একটি স্থূল উপায়। তা হ'লে পার্থক্য কোথায়? তাই মানুষ যতক্ষণ মনের

শুদ্ধি অর্জন না করছে, প্রতীক ছাড়া ভগবানকে কিছুতেই চিন্তা করতে পারবে না।

অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগে একটি কবিতায় আছে :

ঢেঁকি ভজে যদি এই ভবনদী পার হতে পারো বঁধু,
লোকের কথায় কিবা আসে যায় প্রিয়সুখে প্রেমমধু।

ঢেঁকির ভজনা ক'রে যদি আমরা বস্তুলাভ করতে, ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারি, তা হ'লে লোকে পুতুল-পূজো বলুক, অর্বাচীন বলুক তাতে দোষ কি? যে যেভাবে পারে ভগবানের দিকে মনকে ফেরাবার চেষ্টা করুক—ঠাকুরের এই উপদেশ।

ডাঃ সরকার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিবাদী, রাগাত্মিকা ভক্তি তত বোঝেন না। তাই বলছেন, রিপুবশ না করলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর সে কথা স্বীকার ক'রে নিলেন। ডাঃ সরকারের পথকে ভুল পথ বললেন না; বললেন, "ওকে বিচার-পথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে।" রিপুর সঙ্গে আগে সংগ্রাম ক'রে, জয়লাভ ক'রে, পরে সেই বিজিত মনকে ভগবানের দিকে দিতে হয়। কথাটি বুদ্ধিগম্য, কিন্তু করা সহজ নয়। কারণ এখানে আগে চিত্তশুদ্ধি, পরে ভগবানলাভের চেষ্টা।

ভক্তিপথ : সহজ ও স্বাভাবিক

তিনি বলছেন, "ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়।" ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হ'লে, তাঁর নামগুণগান ভাল লাগলে—চেষ্টা ক'রে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয় না। ভগবানকে এই যে ভাললাগা—এই ভক্তিপথ, অনুরাগের পথ, সে পথ সংগ্রামের নয়। ভাগবতে দেখি ভগবানকে গোপীরা কান্তরূপে, যশোদা সন্তানরূপে ও ব্রজবালকরা সখারূপে দেখছেন। এ সবই ভক্তির পথ, অনুরাগের পথ। এই অনুরাগের ফলে যখন তাঁকে

ভাল লাগে, তখন আর ষড়রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে মনকে তাঁর দিকে দিতে হয় না।

ঠাকুর অন্যত্রও বার বার বলেছেন, এই ভক্তিপথই সহজ স্বাভাবিক পথ। এইজন্য যে ভালবাসা মানুষের স্বভাব সেই ভালবাসার পাত্রটিকে নির্বাচন ক'রে নিতে হয়। ভগবানকে যদি ভালবাসার পাত্ররূপে গ্রহণ করা যায় বা গ্রহণের জন্য অভ্যাস করা যায়, তা হ'লে আর সংগ্রাম ক'রে মনকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হয় না। তাঁর উপর মন পড়লে আপনিই তাতে মন একাগ্র হয়। যেমন মা সন্তানকে ভালবাসেন, সন্তানের দিকে তাঁর মনটা একেবারে কেন্দ্রিত থাকে, বিশেষ ক'রে সে যখন শিশু থাকে। সে কি তিনি যোগী বা ধ্যানী ব'লে? তা নয়। যেহেতু সন্তান ভালবাসার পাত্র, মায়ের মনের স্বাভাবিক গতিই তার দিকে, চেষ্টা ক'রে তাকে একাগ্রতার অভ্যাস করতে হয় না। এইটি হচ্ছে সহজ সরল স্বাভাবিক পথ, যে-পথ দিয়ে গেলে ইন্দ্রিয়-সংযমাদি সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন যে সংগ্রাম, তা আর করতে হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এই ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিলেন : যে পুত্রশোকাতুর, সে কি কারও সঙ্গে কলহ করতে, কি নিমন্ত্রণ খেতে বা অন্য সুখ-সম্ভোগ করতে পারে? আরো দৃষ্টান্ত দিলেন, "বাতুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হ'লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?" পরিণাম চিন্তা না ক'রে সে আলোর দিকে যায়।

পরিণামের কথা ভেবে ডাঃ সরকার বলছেন, "তা পুড়েই মরুক, সেও স্বীকার!" ভাব হচ্ছে, অপাত্রে ভালবাসা অর্পিত হ'লে পরিণামে অনিষ্ট হ'তে পারে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, তা হয় না। কেন হয় না? বস্তুধর্ম ব'লে। এখানে ভালবাসার পাত্র যে বস্তুটি, তার চিন্তায় কখনো মানুষের অকল্যাণ হয় না, ভগবান সম্পর্কে তার ধারণা

স্পষ্ট থাক আর না থাক, তার ভালবাসাই তাকে ভগবৎসান্নিধ্যে নিয়ে যাবে এবং সে চেষ্টা না করলেও ভগবানের স্বরূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত হবে। গোপীরা এই ভাবেই ভগবানের স্বরূপ জেনেছিলেন, সাধনার ফলে নয়। তাঁকে ভালবাসার ফলে ভগবানের স্বরূপ তাঁদের কাছে স্বত-উদ্ঘাটিত হয়েছিল। ভাগবতে আছে, গোপীরা বলছেন—'ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্' (১০. ৩১. ৪)—হে ভগবান তুমি কেবল গোপীদের আনন্দদায়ক শ্রীকৃষ্ণ নও, নিখিল প্রাণীর অন্তরাত্মাস্বরূপে, দ্রষ্টারূপে তুমি সব দেখছ। এ-কথা বলার তাৎপর্য এই যে, তোমার বিরহে আমাদের যে বেদনা, তা কি তুমি দেখছ না? কিন্তু বলছেন কিভাবে? না, তুমি যে অখিল প্রাণীর অন্তরে থেকে দেখছ সকলকে—আমাদেরও যে দুঃখ, তা তুমি বুঝতে পারছ। গোপীরা তাঁকে এভাবে যে চিনলেন, কি ক'রে চিনলেন? সাধনা করে? সাধনা তাঁরা করেননি। শাস্ত্র প'ড়ে? শাস্ত্র তাঁরা পড়েননি। তবে কি যাগযজ্ঞাদি ক'রে? না, তাও তাঁরা করেননি। তাঁদের একমাত্র অবলম্বন ছিল ভগবানের উপর প্রাণঢালা ভালবাসা। আর কিছু তাঁদের ছিল না। এই সম্পদে সম্পন্ন গোপীদের কাছে ভগবানও তাঁর স্বরূপ প্রকাশ না ক'রে পারেননি। যে তাঁকে একান্তভাবে ভালবাসে, তার কাছে তাঁর স্বরূপ কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে না। কাজেই গোপীদের এই জানা জ্ঞানী বা যোগীর জানার মতো নয়, অন্তরের ভালবাসা দিয়ে জানা, যার একমাত্র প্রণালী হচ্ছে তাঁকে ভালবাসা। বিচারের সাহায্যে ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা মনকে তাঁতে নিবিষ্ট ক'রে তাঁর স্বরূপ আবিষ্কার করা, এটি জ্ঞানের বা বিচারের পথ। এ-প্রণালী গোপীদের নয়। তাই তাঁরা উদ্ধবকে বলেছিলেন, আমরা যোগী না জ্ঞানী যে মনঃসংযম ক'রে ধ্যান ক'রব? আর ধ্যান ক'রব যে মন দিয়ে সে তো কবেই আমরা শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করেছি।

অনেক সময় মনে এ-প্রশ্ন জাগে, ভালবাসার পাত্র ভগবানকে না জেনে ভালবাসব কি ক'রে? ঠাকুরও বলেছেন, 'যাকে ভালবাসবি তাকে না জেনে কি ক'রে ভালবাসবি?' কথাটি সত্য। কিন্তু এ-ও সত্য যে, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনাতেও যাঁকে জানা যায় না, তাঁকে জেনে ভালবাসতে গেলে কোনদিন ভালবাসা যাবে না। তার জন্য ঠাকুর বলছেন, আরোপ করতে হয়। সকলের হৃদয়েই ভালবাসার অনুভব আছে, কেউ প্রিয়জনকে, কেউ ধনসম্পদকে, কেউ বা মানযশকে ভালবাসে। বিষয়াভিমুখী এই ভালবাসার গতিপথ পরিবর্তিত ক'রে যদি ভগবানের দিকে দেওয়া যায়, তা হ'লে সে ভালবাসা আমাদের বদ্ধ না ক'রে বস্তুধর্মের গুণে মুক্তির কারণ হয়। তাতে আর অশুদ্ধি থাকে না। গোপীরা ভগবানকে যখন চেয়েছিলেন ভগবানরূপে চাননি—কান্তরূপে, দয়িতরূপে চেয়েছিলেন, যে সম্পর্কটি সমাজে নিন্দনীয়। অথচ তাঁরা মুক্তি লাভ করলেন কেন? ভাগবতে এ-প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এইখানেই ভগবানের ভগবত্তা। যে-কোনভাবে তাঁর দিকে মন গেলে বস্তুধর্ম অনুসারে মন পবিত্র হ'য়ে যাবে। তাই ঠাকুর বলছেন, 'কোনরকম ক'রে তাঁতে মন দাও, মোড় ফিরিয়ে দাও।' ভক্তিযোগের এই প্রণালী। তবে এ-ভালবাসা সাধারণ ভালবাসা নয়, মাত্র দোকান-দারী নয়। দোকানদার বলে, এই জিনিষের বদলে এই দাম দিতে হবে। এই আদান-প্রদান যে ভালবাসার মধ্যে নেই, সেটিই আসল ভালবাসা।

গোপীরা ভগবানকে একবার এইরকম প্রশ্ন করেছিলেন। গোপীরা কাতর হ'য়ে বনে বনে ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অনেক খোঁজা, অনেক কষ্টের পর ভগবান আবির্ভূত হলেন। গোপীদের বড় অভিমান হ'ল। ভগবান এলেন, কিন্তু এত কষ্ট দিয়ে এলেন? বললেন, মানুষের নানারকম পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। কেউ ভালবাসা পেলে প্রতিদানে

ভালবাসা দেয়। কেউ না পেয়েও, কোনো অপেক্ষা না রেখেও ভালবাসে। আবার কেউ আছে, ভালবাসা পেয়েও প্রতিদানে ভালবাসে না। কেউ ভালবাসা পেলেও ভালবাসা দেয়, না পেলেও ভালবাসা দেয়। গোপীদের এ-কথার অভিপ্রায় ভগবান বুঝলেন। তিনি বললেন, আমি কিন্তু ঐ দলের কোনটিতেই পড়ি না। ব্যাখ্যা করলেন, যেখানে ভালবাসা পেয়ে ভালবাসে, সেখানে ভালবাসা বা প্রেম বস্তুটিই নেই, যা আছে তা ব্যবসাদারী। আর যে ভালবাসা পেয়েও প্রতিদানে ভালবাসে না, সে কৃতঘ্ন। আর যারা ভালবাসা পেলেও ভালবাসে, না পেলেও ভালবাসে, তারা হয় কৃতকৃত্য, না হয় আত্মারাম। আমি ব্যবসাদার নই, কৃতঘ্ন বা যোগীও নই। গোপীদের জিজ্ঞাসা—তাহ'লে আমাদের এত কষ্ট দিলে কেন? ভগবানের উত্তর—তোমাদের ব্যাকুলতা বাড়াবার জন্য অন্তর্হিত হয়েছিলাম।

জ্ঞানপথ

বিচারের পথ, জ্ঞানযোগের পথ, কোন পথকেই ঠাকুর অস্বীকার করছেন না। বলছেন, "এ-পথ বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দর দর্ ক'রে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি।" জ্ঞানাগ্নিতে কাঁটাটি না পোড়ানো পর্যন্ত এ-কথা বলা সাজে না। পথ কঠিন এইজন্য যে, মানুষের মন বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝে অন্তর দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারে না। আর অন্তরের ভাবপ্রাবল্যের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় তুচ্ছ, এ আমরা সর্বদাই বুঝি। শাস্ত্র বলছেন, জ্ঞানযোগী হ'তে হ'লে প্রথমে নির্বাসনা হ'তে হবে।

ঠাকুর বলছেন, ভক্তিপথে ভগবানকে পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব। তা না হ'লে, তীব্র বিষয়বৈরাগ্য না থাকলে বিচারপথ কোন কাজে লাগে না। তাই বিবেকবৈরাগ্যহীন পণ্ডিত ঠাকুরের কাছে

খড়কুটোর মতো তুচ্ছ। যে পাণ্ডিত্য কেবল বাগাড়ম্বর শব্দজালবিস্তার, কতকগুলি খবর জানা, তা মনকে প্রভাবিত করতে পারে না। সে সংবাদ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হচ্ছে না, জীবনকে প্রভাবিত করতে পারছে না। দুদিন পরে বিদ্যা লয় হ'য়ে যাবে, বুদ্ধিভ্রষ্ট হ'য়ে মন বিষয়াসক্ত হবে, আবার সেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। পাণ্ডিত্য এইভাবে নিষ্ফল হ'য়ে যায় জীবনে, কোন কল্যাণ করে না।

পাণ্ডিত্য ও ধর্মজীবন

'ধর্ম লাভ করতে হ'লে কত বই-ই পড়তে হয়'—মহিমাচরণের এই মন্তব্য শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, প'ড়ে জ্ঞান হ'লে বস্তুলাভ সহজ হ'য়ে যেত। "পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল।" গ্রন্থ, গ্রন্থমাত্র—তার কোন ব্যক্তিত্ব নেই! ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে, এমন কারো কাছ থেকে শুনলে সে-শোনা পড়ার চেয়ে বেশী কার্যকর হবে। কিন্তু পড়া বা শোনার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান পরোক্ষ। তাই বলছেন, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। অর্থাৎ সত্যকে সাক্ষাৎকার করতে হবে—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃহ উ—২.৪.৫.)—আত্মাকে দর্শন করতে হবে। সেইজন্য শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করতে হবে। আত্মার সাক্ষাৎ অনুভবের এই তিনটি উপায়। প'ড়ে বা শুনে নয়, সাক্ষাৎ অনুভব। এ অনুভবের প্রভাব এমনই যে জন্ম জন্মান্তরের বিপরীত সংস্কার নিঃশেষে লুপ্ত হবে। শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সংশয়—বিপর্যয় যায় না, প্রত্যক্ষের বিরোধী ব'লে মনে হয়। 'তুমি ব্রহ্ম' অথবা 'জগৎ মিথ্যা'—এ-কথা বহুবার শুনেও আমরা ধারণা করতে পারি না। এটা শব্দজ্ঞান মাত্র, প্রত্যক্ষ অজ্ঞানকে দূর করতে পারে না। তাই উপায় হিসাবে বলছেন, প্রথমে শুনতে হবে, পরে বিচার করতে হবে। এরপর সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করবার জন্য নিদিধ্যাসন দ্বারা মনকে স্থির করতে

হবে। এভাবে অভ্যাস করতে করতে জ্ঞানযোগের দ্বারা বস্তু সাক্ষাৎকার করতে হবে। তাই শাস্ত্রের কথা শোনা আর সাক্ষাৎ অনুভব—দুই-এর তফাত অনেক।

শাস্ত্রের বা মহাপুরুষের কথা শুনেও জীবন পরিবর্তিত না হ'লে সে কথা অর্থহীন হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের সেই পণ্ডিত ও মাঝির গল্পটি আমাদের মনে রাখতে হবে। নৌকায় উঠে পণ্ডিত মাঝিকে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র কি কি পড়েছে জিজ্ঞাসা করছে, আর মাঝি প্রতিবারই বলছে. সে কিছুই জানে না, কিছুই পড়েনি। পণ্ডিত বললেন, 'তোর জীবনের বার আনাই বৃথা গেল।' এমন সময় ঝড় উঠল। মাঝি বললে, 'ঠাকুর মশায়, সাঁতার জানেন?' এবার পণ্ডিতের 'না' বলার পালা। মাঝি বললে, তা হ'লে আপনার ষোল আনাই বৃথা গেল।

আমরাও শাস্ত্রাদি কতকটা জানি, কিন্তু আসল কথাটা জানি না, সুতরাং আমাদের ষোল আনাই বৃথা যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, শাস্ত্রবাক্য বৃথা মুখে ব'লে কি হবে? সেটির সার বস্তু জানতে হবে এবং জীবনে কার্যকরী করতে হবে। তিনি বলতেন, 'সা চাতুরী চাতুরী'—সেই চাতুরীই চাতুরী যা দিয়ে সংসারসমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায়। তা না জানলে, না করতে পারলে আর জানলাম কি? শাস্ত্র বলছেন:

> তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
> অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃত সৈষ সেতুঃ॥ (মুণ্ডক ২.২.৫)

সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে জান, অন্য সব কথা পরিত্যাগ কর, অমৃতত্ব লাভের এই একমাত্র পথ।

উপনিষদের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদেও দেখা যায়, নারদ যে যে বিষয় অবগত আছেন, তার একটা তালিকা দিচ্ছেন:

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং
চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং
রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং
ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং
সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি ॥ (ছান্দোগ্য—৭ ১.২)

তালিকাটি থেকে বোঝা গেল তৎকালে প্রচলিত সকল বিদ্যায় তিনি পারঙ্গম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন, আমি মন্ত্রবিৎ মাত্র আত্মবিৎ নই। শুনেছি আত্মবিদ্ ব্যক্তি শোক অতিক্রম করেন—তরতি শোকমাত্মবিৎ। অনাত্মবিদ্ বলে—আমি শোক করছি—'সোঽহং ভগবঃ শোচামি।' আপনি আমাকে আত্মজ্ঞান দিয়ে সেই শোকের পারে নিয়ে যান—'তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু।' (ছা—৭.১.৩)

সর্ববিধ জাগতিক বিদ্যা অধিগত হলেও আত্মাকে না জানলে শোককে অতিক্রম ক'রে আনন্দ অমৃতের অধিকারী হওয়া যায় না। এখন এই আত্মজ্ঞানের নানা উপায়ের মধ্যে এখানে ঠাকুর বললেন, বিচারের পথ, জ্ঞানযোগের পথটি কঠিন। কারণ তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি দরকার। মনটি এমন তৈরী হবে যে বিচারের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা যে সত্যে আমরা উপনীত হবো, মন তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে। সাধারণতঃ বিচারের দ্বারা আমরা যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, অন্তঃকরণ ঠিক তার বিপরীত পথে চলতে চেষ্টা করে। তাই সে বিচার আমাদের কোন কাজে লাগে না।

ঠাকুর বলছেন,· "আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে উপর-চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়।" এই চালে ভুল হওয়াটা নিজেরা একটু বিচার ক'রে দেখলেই বোঝা যায়। জিনিষটি বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই জীবনে তাকে পরিণত করা যাচ্ছে না। সংসারী মানুষ মুখে

সত্যের প্রংশসা করে, কিংবা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত ক'রে বলে, 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্'—সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। কিন্তু পরীক্ষার সময় এলে আর সত্যের আঁট থাকে না। বিষয়াসক্তির জন্য, অর্থ সুখ যশের প্রয়োজনে আমরা পদে পদে মিথ্যা বলি। বিষয়াসক্তি ত্যাগ না হ'লে সত্যের বা নীতির পথে স্থির থাকা কঠিন, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। বিষয়াসক্তি যার আছে সেই সংসারী। সংসার মানে যা চ'লে যায় নশ্বর। আর সেই নশ্বর বস্তুতে যার অনুরাগ, সেই সংসারী। বাইরে তারা যেমনই কথা বলুক না কেন ভিতরে তারা বিষয়াসক্ত। তারা পণ্ডিতম্মন্য—'স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ'—নিজেদের বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী মনে করে। ঠাকুর পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, নিজেরা খেলছে, কোথায় ত্রুটি হচ্ছে নিজেরাই বুঝতে পারছে না। চালে ভুল হ'য়ে যায়, লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। জীবনে যে পরমধন অর্জন করতে পারত তার সুযোগ হারায়। কালিদাস বলেছেন,—'অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্'—অল্পের জন্য অনেক হারাচ্ছ সুতরাং তুমি বিচারবিষয়ে মোহগ্রস্ত। এতটা বুদ্ধিবৈকল্য সত্বেও মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান্ মনে করে।

ডাঃ সরকার দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখে বললেন, বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হ'ত না। ঠাকুর বললেন, পঞ্চবটিতে মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, 'মা! আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম ক'রে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ ক'রে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে। মায়ের এই দেখিয়ে দেওয়া—বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে পাওয়া নয়, মনের শুদ্ধ অবস্থায় তত্ত্বের প্রকাশ। ঠাকুরের মাকে বলা মানে—শুদ্ধ বুদ্ধিতে বস্তু অনুভব করা। ঠাকুরের 'মা' মানে যাঁর আলোকে জগৎ আলোকিত—তার নাম শুদ্ধ বুদ্ধি—'যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা'—যিনি সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করছেন।

মোহনিদ্রা

শাস্ত্র বলছেন, বুদ্ধির স্বভাব হ'ল তত্ত্বপক্ষপাৎ—'তত্ত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবো ধিয়াম্'। তত্ত্বের স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করা বুদ্ধির স্বভাব, কিন্তু টিনের ঢাকনা পরানো আলোর মতো, এই বুদ্ধি রাগদ্বেষাদি মলিন আবরণে আবৃত থাকায় সে আদৌ কোনো বস্তুকে প্রকাশ করতে পারছে না। তাই সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য ; নিত্যকে অনিত্য, অনিত্যকে নিত্য ; সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ ব'লে ভ্রম হচ্ছে। এই অজ্ঞান-তত্ত্বকে না জানা বা বিপরীতভাবে জানা—এর নাম মোহনিদ্রা। আমাদের সমগ্র জীবনটাই নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রা। চণ্ডীতে বলা হচ্ছে—'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা'—মহামায়ার মায়া—মা সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা যেমন সংসারের কাজ করেন না হ'লে জগৎলীলা চলে না। সকলের ঘুম ভেঙে গেলে জগন্মাতার খেলা চলবে না এবং যতক্ষণ তিনি মোহজাল থেকে মুক্ত ক'রে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর খেলা আমরা বুঝতে পারব না। তাই সুরথ রাজাকে ঋষি বলছেন :

> তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
> আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ চণ্ডী ১৩.৪-৫

হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। তাঁকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করলে তুমি যা চাইবে—ইহলৌকিক অভ্যুদয়, কি পারলৌকিক স্বর্গসুখ, কিংবা মুক্তি—তিনি সব দেবেন।

এরপর ঠাকুর বলছেন, "আমি তো বই-টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ—মার নাম করি ব'লে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং ?" বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য—সাংসারিক দৃষ্টিতে যে গুণগুলির দ্বারা মানুষ বড় হবে মনে

করে—তার কোনটাই নেই ঠাকুরের। তাঁর একটিই মাত্র অস্ত্র আছে, শিশুর মতো মায়ের উপর অগাধ নির্ভরতা। এই নির্ভরতার জন্যই যোগের দ্বারা যোগীর যে সিদ্ধিলাভ হয়, জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানীর যে ফললাভ হয়, বেদ-বেদান্তে যা আছে, মা সব তাঁকে জানিয়ে দিলেন। তাঁর নিজের আর কিছু করার দরকার নেই। মা তাঁর ভিতরে থেকে সর্ববিষয়ে তাঁকে চালাচ্ছেন। জগন্মাতার সমস্ত শক্তি, বিশ্বের কল্যাণ-কারিণী শক্তি, তাঁর ভিতর দিয়ে নির্বাধভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, অন্তর বাহির সমস্ত জুড়েই মা বিরাজিতা। যাঁর হাতের মুঠোয় জগন্মাতা তাঁর আর ভাবনা কি? যখন যা দরকার চাইলেই যদি মায়ের কাছে পাওয়া যায়, তা হ'লে অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন কি? সকলের অন্তরে যদিও মা শক্তিরূপে আছেন, তবুও আমরা যুদ্ধে হারি, কারণ, অবিদ্যার আবরণের জন্য মায়ের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি না।

দুই

কথামৃত—১।১৫।৩

অবতার ও ঈশ্বরতত্ত্ব

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভিতর যে অপূর্ণতা আছে ঠাকুর সেটি দূর করবার জন্য ঈশানকে ডাক্তারের সঙ্গে বিচার করতে বলছেন। ডাক্তার খুব সরল, বুদ্ধিমান্, অন্তরটিও খুব ভাল, কিন্তু যা তাঁর বুদ্ধিতে কুলোয় না এমন অনেক বস্তুতে তাঁর বিশ্বাস নেই। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল অন্যতম। নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে রোগীরা আসেন এবং প্রত্যেক রোগের লক্ষণগুলি তিনি গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন ব'লে তাঁর এক একজন রোগী দেখতে সময়ও লাগে অনেক। কিন্তু ঠাকুরকে দেখার পর থেকে তিনি তাঁর কথাই ভাবেন। এই কথা একদিন ঠাকুরকে বলছেন, "তোমার পাল্লায় পড়ে আমার সব গেল; রাত্তির থেকে পরমহংস চলছে।" রোগীরা যাকে এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার জন্য পায় না, সেই তিনি পাঁচ ছয় ঘণ্টা ঠাকুরের কাছে ব'সে কাটাচ্ছেন—এতই তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে তাই ব'লে যে কোন বিচার না ক'রেই ঠাকুরের সব কথা মেনে নেবেন, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, সে-রকম লোক তিনি ছিলেন না। কিন্তু ঠাকুরও ছাড়বার পাত্র নন। ডাক্তারের ভিতর যেখানে যেখানে তিনি খোঁচ দেখেছেন, সেটাই দূর করতে চেয়েছেন। ডাক্তার অবতার মানেন না। তাই ঠাকুরের ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক থাকলেও এই প্রসঙ্গে তাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বলেন, 'তোমরা

এই ভাল মানুষটির মাথা খাচ্ছ। মানুষ কখনও 'ঈশ্বর' হতে পারে?' অন্যান্য দিন ঠাকুর একথায় মজা করেন, কিন্তু আজ তাঁর কি হ'ল, তিনি ঈশানকে এই প্রসঙ্গে কথা বলতে বললেন। অবতার মানা যে নির্বুদ্ধিতা নয়—এটিই ডাক্তারকে বোঝানো তাঁর উদ্দেশ্য। ঈশান প্রথমটায় ইতস্ততঃ করায় ঠাকুর বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "কেন? সঙ্গত কথা ব'লবে না?" ঠাকুরের ভক্তেরা ইতিপূর্বে যখন তাঁকে অবতার ব'লে প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, সে-সময় তিনি একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বলেছিলেন, 'কত বড় বড় পণ্ডিত (একে) অবতার ব'লে গেছে, আর আজ এই ডাক্তার বা অভিনেতারা কি প্রচার করবে! অবতার শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গিয়েছে।' যিনি এই কথা বলেছেন, তাঁর আজ ঈশানকে অবতার-প্রসঙ্গে কিছু বলার জন্য যে আদেশ, এর মূল কারণটি তো আত্মপ্রচার হ'তে পারে না। তিনি যাকে ভালবাসেন এবং যে তাঁকে ভালবাসে সেই ডাক্তারের অপূর্ণতা, তার ভ্রান্ত ধারণা দূর করাই তাঁর উদ্দেশ্য। ঈশানের কথার জের টেনে তাই বলছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। গীতায় আছে:

> অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
> পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯. ১১

মূঢ় ব্যক্তি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পেরে তাঁকে মানুষ ভেবে অবজ্ঞা করে। আর মানুষের পক্ষে কি তাঁকে বোঝা কখনো সম্ভব? আমাদের এই পৃথিবীর মতো কোটি কোটি পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা, যাঁর নির্দেশে এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তু চলছে, তাঁকে কি ধূলিকণার মতো নগণ্য মানুষ কোন প্রকারে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে? ভগবান বিশ্বস্রষ্টা, রক্ষাকর্তা, আবার সংহারকারী—একথা যদিও বা বোঝা যায়, কিন্তু তিনি মানুষ হ'য়ে মানুষের মতো সমস্ত আচরণ করছেন, এ ধারণা

করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বর মনুষ্যশরীর ধারণ ক'রে সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক সমস্ত ভোগ করছেন, এমন-কি প্রিয় মিলনের জন্য উৎসুক হচ্ছেন ও প্রিয়বিরহে কাঁদছেন—সমস্ত অবতারদের মধ্যেই এই লীলা দেখা যায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের এই ভোগ মেনে নেওয়া কঠিন। প্রত্যক্ষদৃষ্ট এই ব্যক্তিই যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এ-কথা মানুষ কি ক'রে কল্পনা করবে? এ-কথাই দেবকী সবিস্ময়ে বলেছেন, 'অহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ।' যিনি অসীম অনন্ত তাঁকে এই চোদ্দ-পোয়া মানুষের মধ্যে আমরা কি ক'রে সীমিত ব'লে ধারণা করতে পারি? তাই ঠাকুর বলছেন, "এক সের ঘটিতে কি চার-সের দুধ ধরে?" ঈশ্বর কি হ'তে পারেন, আর কি হ'তে পারেন না, মানুষের পক্ষে তার সীমা নির্দেশ করা কোনদিনই সম্ভব নয়—কারণ তিনি স্বরাট্, তিনি বিরাট এবং জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

এই প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী নারদের গল্পটি স্মরণীয়। একজন নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু—আপনি কি বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন? ভগবান কি করছেন দেখলেন? নারদ বললেন, তিনি ছুঁচের মধ্য দিয়ে হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন। লোকটি এই অসম্ভব কথা শুনে হেসেই অস্থির। সে বিশ্বাসই ক'রল না যে নারদ সত্যই বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন। অপর এক ব্যক্তি কিন্তু নারদের উত্তর শুনে বললেন, তা হ'তে পারে, তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। এই যে কথাটি—তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়—এটি ধারণা করতে হবে। ঠাকুর তাই বার বার বলছেন, তাঁর 'ইতি' করতে যেও না। তিনি সাকার, নিরাকার এবং সাকার-নিরাকারের পারে এবং তিনি যে আরো কত কি তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তা হ'লে তাঁকে বোঝার উপায় কি?

তার উত্তর দিচ্ছেন ঠাকুর, "তাই সাধু মহাত্মারা যাঁরা ঈশ্বরলাভ

করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা ল'য়ে থাকেন, যেমন উকিলরা মোকদ্দমা ল'য়ে থাকে।" যদি ভগবানের সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেন তবে সাধুরাই তা পারেন, কারণ তাঁদের মন-প্রাণ-আত্মা ঈশ্বরেতে নিবিষ্ট। তাঁরা সমস্তক্ষণ ঈশ্বরচিন্তা করেন, সুতরাং তাঁরাই ঈশ্বরতত্ত্ব বলতে সমর্থ। তাই তাঁদের বিশ্বাস করতে হয়।

শ্রীভগবানের ইতি করা যে সম্ভব নয়, বহুরূপীর রং বদলের গল্পের মধ্য দিয়েও ঠাকুর বহুবার সে কথা বলেছেন। উপনিষদও ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর উপর বহু বিরুদ্ধ গুণের আরোপ করেছেন. যার ফলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝা তো দূরের কথা, বিভ্রান্তি আরো বেড়ে যায়। সেইজন্য একবার একজন ঋষি বলেছিলেন, যেমন করে বলে—এটি একটি ঘোড়া—এটি একটি গরু—সেইভাবেই কেন ব্রহ্মকে বর্ণনা কর না? কিন্তু ব্রহ্মকে সেইভাবে বোঝানো যায় না, কারণ তিনি এই সাধারণ চক্ষুর অবিষয়। অন্ধকে যেমন রং বোঝানো সম্ভব নয়, তেমনি যতক্ষণ না কারো ঈশ্বরোপলব্ধি হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁকে বহুবিধ চেষ্টা করেও ঈশ্বরের তত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে বোঝানো সম্ভব নয়।

চিত্তশুদ্ধি ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার

ঈশ্বর-দর্শনের জন্য দরকার শুদ্ধদৃষ্টি, শুদ্ধবুদ্ধি। যাদের সে শুদ্ধবুদ্ধি নেই, তারা বলবে মানুষকে ভোলাবার জন্যই ঈশ্বরের কল্পনা। তাদের মত—বিজ্ঞানের দ্বারা যা প্রমাণ করা যায় না, তার অস্তিত্ব মানব কেন? অবশ্য সকল বৈজ্ঞানিকই যে এ-কথা বলেন, তা নয়। এ-যুগে অনেক বৈজ্ঞানিকই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। আবার অনেকে এই বিষয়টিকে তাঁদের অধিকারের বহির্ভূত ক'রে রেখেছেন।

শাস্ত্রও ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন—'যন্মনসা ন মনুতে', আবার অন্যত্র

বলেছেন, 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্।' এ-বিরোধের সামঞ্জস্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সাধারণ অশুদ্ধ মনের কথা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে রাগদ্বেষমুক্ত শুদ্ধ সংস্কৃত বাসনাবিবর্জিত মনের কথা। মন ছাড়া মানুষ কি দিয়েই বা জানতে পারে? মন শুদ্ধ হ'লে তখনই বোধে, বোধ হয়; যা দিয়ে বুঝব এবং যাঁকে বুঝব, দুটিই তখন এক হয়—তারই নাম, বোধে বোধ, হওয়া।

শুদ্ধ বুদ্ধি যা, শুদ্ধ আত্মাও তাই। শুদ্ধ বুদ্ধিতে শুদ্ধ আত্মার মিলন —সর্বভেদ দূর হয়ে গিয়ে 'তদাকারাকারিত' হওয়া। এই একীকরণ হ'লেই তাকে বলে জানা। আচার অনুষ্ঠান বিচারের মাধ্যমে এই বোধ সম্ভব নয়—একমাত্র চিত্তকে সর্বদ্বন্দ্বমুক্ত ক'রে শুদ্ধ করতে পারলে তার দ্বারাই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সম্ভব। একবার চিত্ত শুদ্ধ হ'লে সব সমস্যার সমাধান হয়। যেমন ঠাকুর বলতেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—একটি দেশলাই জ্বাললেই আলো হ'য়ে যায়।

কিন্তু সেই দেশলাই জ্বালানোই যে কঠিন। দেশলাই ঘষে ঘষে যে জ্বলছে না। যদিও তা জ্বালাবারও প্রক্রিয়া আছে, কিন্তু মানুষের সে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা নেই। সেই চেষ্টাটি করতে হবে। বিজ্ঞানী বলেন, তাঁর সমস্ত পরীক্ষিত সত্য তিনি যে-কোন লোককে বোঝাতে সক্ষম। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে যার কোনরকম প্রাথমিক জ্ঞানই নেই, তাকে গবেষণাগারে বসিয়ে দিলে সে যেমন কিছু বুঝবে না, তেমনি আধ্যাত্মিক বিদ্যার ক্ষেত্রেও দরকার মানসিক প্রস্তুতি। তত্ত্ব জানার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু জানবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা সকল সাধনার থেকেও কঠিন। যে-কোন বস্তুর জ্ঞানলাভের জন্য একটি পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। দুরূহতম আত্মবস্তুর জ্ঞানলাভের জন্য সেই প্রস্তুতি অবশ্যই আরো কঠিন। সেটি না নিয়েই আমরা মন্তব্য প্রকাশ করি, ঈশ্বরকে যখন সবাই জানতে পারে না, তখন তার অস্তিত্ব মানি

কি করে? এই ভাবটি ঠিক নয়। সকলেই জানার অধিকারী, কিন্তু সব জানাই সাধনসাপেক্ষ।

ঠাকুরের উপদেশ-প্রণালী

এবার ঠাকুর ডাঃ সরকারকে বললেন, "সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ।" কিন্তু যাঁদের সামনে বলছেন, তাঁরা সন্ন্যাসী নন সংসারী, তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ত্যাগ সম্ভব নয়। তাই সাবধান হ'য়ে বলছেন, "কিন্তু একথা আপনাদের পক্ষে নয়, এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা যতদূর পারো, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাকবে।" কেবল অনাসক্ত থাকার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, অনাসক্তি অভ্যাসের উপায়ও বললেন, "মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে!" স্ত্রীসঙ্গ থেকে তিনি দূরে থাকতে বলছেন সত্য, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের ঘৃণা করেছেন। সকল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মাতৃভাবই শ্রেষ্ঠভাব, এ-কথাই তিনি বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক যেমন মধুর তেমন পবিত্র, তাই এ-সম্পর্কের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—তিনি মাতৃরূপে সর্বভূতে আছেন। সুতরাং ঘৃণার প্রশ্ন নেই। ঘৃণা ক'রে কাউকে দূরে রাখা যায় না। মুকুন্দদাসের একটি গানে আছে:

যারে তুই করবি ঘৃণা, রাখবি দূরে দূরে—
সে তোরে টানবে নীচে, রাখবে পিছে,
রবে সারা হৃদয় জুড়ে।

ঘৃণা করলে ঘৃণার বস্তু সারা হৃদয় জুড়ে থাকে। তাই ঘৃণা নয়, একটি শুদ্ধ পবিত্র ভাব হৃদয়ে রাখলে আর কোন ভয় থাকে না।

ঠাকুর যখনই কোন উপদেশ দিয়েছেন, সেটি কার্যকর করবার জন্য প্রণালীও নির্দেশ করেছেন। বিশেষ অধিকারীর জন্য তাঁর বিশেষ উপদেশ থাকলেও সর্বসাধারণের সামনে যখনই কিছু বলেছেন—বলেছেন অতি সাবধানে। অতি উচ্চ দুরূহ কোন আদর্শ সাধারণের সামনে তুলে ধরতে নেই, কারণ সেটি পালন করতে না পারলে মনে হতাশা বা হীনম্মন্যতা আসতে পারে।

গীতাতেও ভগবান বলেছেন, জ্ঞানযোগ কর্মযোগ দুই-ই ভাল, কিন্তু কর্মযোগ আরো ভাল। কারণ এ-পথে সকলেই এগোতে পারে। আর যারা এগিয়ে আছে, কর্মযোগের দ্বারা যাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, মন অনেকটা বশীভূত হয়েছে, তাদেরই পক্ষে জ্ঞানযোগ উপযোগী। মনের এ-প্রস্তুতি না থাকলে জ্ঞানযোগের চর্চা করলে অপকারই হয়। তাই ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, 'সবই করা যাচ্ছে, অথচ আমিই ব্রহ্ম, এ বলা ভাল নয়।' যে প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব অর্জন করেছে, যাঁর অভিমান প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে এসেছে, একমাত্র সেই বলতে পারে, 'আমিই ব্রহ্ম'। তার পক্ষে এটি উপযোগী সাধন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অধীনতা থেকে যে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, সে 'আমিই ব্রহ্ম' বললে তার অধোগামী হবার ভয় থাকে।

এজন্য খুব উচ্চ আদর্শ সামনে রাখলেই হয় না, উপদিষ্ট ব্যক্তি সেই আদর্শের অধিকারী কিনা, তা বিচার ক'রে আদর্শ সামনে রাখতে হয়। 'অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ'—যারা অধিকারী তাদেরই সেই আদর্শ অনুসরণ ক'রে ফলসিদ্ধি হয়। অনধিকারী অনুসরণ করলে তার সর্বনাশ। ভাগবতে আছে, ভগবানের উপদেশ শুনবে, তাঁর লীলাকথা স্মরণ করবে, কিন্তু তিনি যা করেন তা কখনো করতে যাবে না। তাঁর স্বরূপে যে অবস্থিত হবে, সে-ই মাত্র তাঁর কাজ করতে পারবে—অপরে নয়। এইজন্যই শাস্ত্রের কোন কোন নির্দেশ পালন

করতে যেয়ে অনেক সময় অনর্থ উপস্থিত হয়, কারণ আমরা অধিকারী বিচার করি না। শাস্ত্রের নির্দেশের আপাত অর্থ একটি হলেও ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর কাছে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

এ-বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। একদা দেবতাদের পক্ষ থেকে ইন্দ্র আর অসুরদের পক্ষ থেকে বিরোচন ব্রহ্মার কাছে উপদেশ প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন। সদ্‌গুরু কখনো পক্ষপাতিত্ব ক'রে ভিন্ন উপদেশ দেন না, সুতরাং ব্রহ্মা তাঁদের একই উপদেশ দিলেন। কিন্তু অধিকারিভেদে উপদেশের অর্থ ইন্দ্র এক রকম বুঝলেন, বিরোচন বুঝলেন আর এক রকম। তাঁদের প্রশ্ন ছিল আত্মা কি? কারণ তখন দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে, সেই সংগ্রামে জয়ী হ'তে গেলে অমরত্ব লাভ করতে হবে। তাঁরা শুনেছিলেন আত্মাকে জানলেই নাকি অমর হওয়া যায়। সেই আত্মজ্ঞানের কৌশলটা জেনে নেবার জন্যই তাঁরা উপদেশপ্রার্থী। ব্রহ্মা তাঁদের বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য সাধন করিয়ে এক সরা জল আনতে বললেন। জল আনার পর দুজনকেই বললেন, ঐ সরার জলে কি দেখছ? যা দেখছ তাই-ই আত্মা। দুজনেই জলে স্ব-স্ব প্রতিবিম্ব দেখলেন। বিরোচন কি বুঝলেন? তিনি সোজা বুঝলেন, এই দেহটাই আত্মা—একেই তো জলের ভিতর দেখা যাচ্ছে। দেহকে পুষ্ট রাখ, সুস্থ সবল কর—যুদ্ধে জয়লাভ হবেই। তিনি খুশী মনে ফিরে গেলেন। ইন্দ্রও প্রথমে ঐ-রকম ফিরে যাচ্ছিলেন—যেতে যেতে তাঁর মনে হ'ল অলংকারবর্জিত এই দেহটা এখন এক রকম দেখাচ্ছে, আবার অলঙ্কার-ভূষিত অবস্থায় তো অন্যরকম দেখাবে। তবে কি দেহের ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য আত্মাও ভিন্ন হচ্ছে? এ-প্রশ্ন মনে জাগলো, আত্মা নিত্য হ'লে তাঁর একটা স্থায়ী রূপ আছে তো! পরিবর্তিত হ'লে নিত্য হ'ল কি ক'রে, সৎ হ'ল কি করে? অনিত্য অসৎ এই দেহকে জেনে তা হ'লে অমর হওয়া যায় না। তখন আবার

ব্রহ্মার কাছে নিজের সংশয়ের কথা বললেন। প্রশ্ন শুনে, খুশী হ'য়ে ব্রহ্মা আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্যের আদেশ দিলেন। এই ভাবে উপদেশ ও ব্রহ্মচর্য চলল একশ এক বৎসর ধরে। তারপর ইন্দ্র আত্মার স্বরূপ জানলেন।

এই যে অধিকারিভেদে উপদেশের তাৎপর্য ভিন্ন হয়, এটি বিশেষ ভাবে মনে রাখবার মতো। উপদেশ দেবার সময় অধিকারীর বিচার একান্ত প্রয়োজন। ঠাকুর কথামৃতে বার বার বলেছেন, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। সোঽহং বলা ভাল নয়।' 'সোঽহং' শাস্ত্রের কথা, সিদ্ধান্ত—তবু ভাল নয় যে বলছেন তা সাধারণ মানুষের কথা মনে ক'রে। অনধিকারীর পক্ষে 'সোঽহং' যে কত অনর্থ ঘটায় তা পণ্ডিত-মূর্খদের দেখলেই বোঝা যায়। শাস্ত্র পড়লেই যে শাস্ত্রের তাৎপর্য বোঝা যায় না, তার দৃষ্টান্ত ঠাকুরের সেই রাজা ও ভাগবত-পণ্ডিতের চমৎকার গল্পটি। 'তুমি আগে বোঝ' রাজার এই কথাটি বিশ্লেষণ করতে করতে পণ্ডিতের কাছে ভাগবতের সার সত্য উদ্ভাসিত হ'ল যে, তিনিই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা। এই সত্য উপলব্ধির পর আর তিনি রাজার কাছে গেলেন না। কারণ তাঁর অর্থের আর প্রয়োজন নেই। তিনি সত্যকে জেনেছেন, তাঁর সবকিছু তখন ভগবানে সমর্পিত। তিনি লোক মারফৎ রাজাকে জানালেন, এইবার আমি ভাগবতের অর্থ বুঝেছি। সেই তত্ত্বে নিষ্ণাত হ'য়ে ভগবানে সব সমর্পণ করবার জন্য গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। এরই নাম—বোঝা।

শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও অর্থবোধ

শুদ্ধবুদ্ধি ছাড়া শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' —তর্কের দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না, তত্ত্বলাভ হয় না। 'ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈঃ'—যজ্ঞ দান ধ্যানের দ্বারাও হয় না, এ-কথা গীতায় শ্রীভগবান বলছেন। বৃহদারণ্যকও বলেছেন, 'নানুধ্যায়াদ্

বহুশব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ' (৪.৪.২১)—বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন মনকে শুদ্ধ করে না। ঠাকুর বলছেন, 'শাস্ত্র কি রকম জানো, চিনিতে বালিতে মেশানো আছে।' বালি পরিহার ক'রে চিনিটুকু নিতে পারলে, শাস্ত্রের আলোচনা থেকে মূল তত্ত্বটি পৃথক্ ক'রে নেওয়া গেলে শাস্ত্র-পাঠের ফললাভ হবে।

এজন্য আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, গুরুমুখ ছাড়া শাস্ত্র অন্বেষণ ক'রে লাভ হবে না। তার কারণ কি? গুরু জানেন কোন্‌টি কার পক্ষে পথ্য ও কোন্‌টি অপথ্য। তিনি বিচার ক'রে পথ দেখিয়ে দিলে তত্ত্বলাভ করা সহজ। স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করলে, শাস্ত্রার্থ নিরপেক্ষভাবে জানতে গেলে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা। কারণ যে যন্ত্র দিয়ে শাস্ত্রচিন্তা করছি, তার ভিতর এত মলিনতা যে তা তত্ত্বকে প্রকাশ করে না। তাই শাস্ত্র বলছেন, 'আচার্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বীর্যবত্তরা ভবতি'—কেবল আচার্য থেকে অর্জিত বিদ্যাই অধিকতর শক্তিশালী হয়। আর অন্য বিদ্যাগুলি অবিদ্যার কাজ করে। যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরই মুখে শ্রুত হ'লে শাস্ত্রার্থ বোঝা যায়। সেইজন্যই প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর, যিনি অধিকারিভেদে শিষ্যদের যার যাতে মঙ্গল হয়, তাকে সেইভাবে শিক্ষা দেন।

এইজন্য ঠাকুর এক এক জনকে এক একরূপ উপদেশ দিয়েছেন, আপাত-দৃষ্টিতে যেগুলি পৃথক্। কেউ হয়তো বলবেন, ঠাকুর তাঁর ত্যাগী সন্তানদের বাছা বাছা উপদেশ দিয়েছেন, মাখনটুকু তুলে তাঁদের জন্য রেখে আমাদের কেবল ঘোল দিয়েছেন—তা নয়। মাখন সকলের পক্ষে পথ্য নয়। সকলের পেটে সব খাবার সয় না, মা তাই আলাদা আলাদা ক'রে রান্না করেন। যেমন একদিন শ্রীশ্রীমায়ের তৈরী পাতলা পাতলা রুটি ও অন্যান্য জিনিস খাবার পর ঠাকুর নরেনকে 'কেমন খেলে' জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'রোগীর পথ্য

খেলাম।' ঠাকুর মাকে ডেকে বললেন, 'ওগো নরেনের জন্য মোটা মোটা রুটি আর ঘন ডাল ক'রে দেবে, তবে ওর পোষাবে।' এইরকম সব উপদেশ সকলের জন্য নয়, ঠাকুর সেকথা বার বার বলেছেন।

অহৈতুকী ভক্তি

ঠাকুর অহৈতুকী ভক্তির কথা বলছেন। এ-ভক্তি নিষ্কাম, স্বাভাবিক ভক্তি। প্রহ্লাদের এই ভক্তি ছিল। যিনি বলেন, আমি কিছু চাই না, কেবল হরিপাদপদ্মে অব্যভিচারিণী ভক্তি চাই। ভাগবতে আছে :

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ১.৭.১০

যে সমস্ত মুনি আত্মারাম, নিজের ভিতরের আনন্দে পরিপূর্ণ, কোন গ্রন্থি বা বাসনা নেই, তাঁরাও ভগবানকে ভক্তি করেন, ভগবানের এমনই গুণ যে তাঁকে তাঁরা ভাল না বেসে পারেন না। কোন হেতু বা বাসনা নেই, তবু ভগবানকে ভালবাসেন ব'লে তাঁদের ভক্তিকে 'অহৈতুকী' বলা হয়েছে।

আত্মা হলেন স্বতঃপ্রিয়—সকলেই নিজের আত্মাকে ভালবাসে, এর কোন কারণ নেই। অন্য বস্তুকে ভালবাসার কারণ সেগুলি আত্মার পক্ষে উপযোগী, তার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু যিনি কোন কারণে নয়, স্বভাবতঃ, বস্তুধর্মেই প্রিয়, তিনিই হলেন আত্মা। সুতরাং তিনি স্বতঃপ্রিয়, তাঁকে না ভালবেসে উপায় নেই। আত্মাকে এই দৃষ্টিতে দেখে ভক্তি করলে তার কোন হেতু থাকতে পারে না।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। কেন ১. ২.

যিনি এই সকলের পশ্চাতে তাঁকে স্বভাবতঃ লোকে ভালবাসবে।

গীতায় চার রকমের ভক্তের কথা শ্রীভগবান বলেছেন :

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭. ১৬

পীড়িত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ভোগাভিলাষী এবং জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ ভক্ত ভগবানের ভজনা করেন। এদের মধ্যে যে জ্ঞানী, ভগবানের স্বরূপকে জেনে যে ভালবাসে, ভগবান বলছেন, সে আমার আত্মা। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠতা। 'উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'—এরা সকলেই মহান্, ভগবানের পথে চলছে, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মা, আমার স্বরূপ। স্বরূপ ব'লে তার ভালবাসার কোন হেতু নেই।

কিন্তু গীতায় আর্ত ও অর্থার্থীদের নিন্দা করা হচ্ছে না, তারাও মহান্। কারণ পীড়িত হ'য়ে হাহাকার করার চেয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া, কিংবা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য শঠতার পরিবর্তে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর। শুদ্ধাভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল, নির্বাসনা না হ'লে হয় না। ভগবানের কাছে কোন কামনা জানানো নিন্দনীয় নয়, তবে তার চেয়েও ভাল—কেবল তাঁকে চাওয়া। ঠাকুরের ভাষায় রাজার কাছে লাউ কুমড়ো চাওয়ার মতো। যিনি রাজরাজেশ্বর তাঁর কাছে তুচ্ছ জিনিষ চাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাঁকে চাইলে সব ছাড়তে হবে। সুতরাং নির্বাসনা না হওয়া পর্যন্ত অহৈতুকী ভক্তি আসে না। তবে সাধারণভাবে ভক্তি করতে করতে বাসনা কমতে থাকে, অন্তর শুদ্ধ হয়—ঠাকুর যাকে বলেছেন, চোখের জলে সুচের কাদা ধুয়ে গেলে চুম্বকের আকর্ষণ বোঝা যায়। শুদ্ধ হবার পর ভগবানের উপর যে দুর্বার আকর্ষণ হবে, তা অহৈতুকী। অর্থ-যশাদির জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা কৌশল ক'রে নয় যে, তাঁকে চাই তিনিই সব দিয়ে দেবেন। কেবল তাঁর জন্যই তাঁকে চাওয়া, এইটি হ'ল সাধকের ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

ঠাকুরের সর্বভাবের পরাকাষ্ঠা

ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে তাঁর অসুখটা ভাল করে দিতে বলছেন, যাতে তিনি ভগবানের নাম গুণগান করতে পারেন। তদুত্তরে ডাক্তার তাঁকে ধ্যান করতে বলায় ঠাকুরের উত্তর "আমি একঘেয়ে কেন হবো ?" ঠাকুরের একঘেয়ে না হবার কারণ বহু বিচিত্র রূপে তাঁকে আস্বাদন করার ইচ্ছা। সাধকের সাধনার এই পরাকাষ্ঠা—সর্বরূপে তাঁকে দেখা, সর্বভাবে অনুভব করা। উপনিষদ্ বলছেন, সর্বকামঃ সর্বরসঃ সর্বগন্ধঃ—যেখানে যা কিছু দেখছি সব তিনি, যা কিছু আস্বাদন করছি তাঁকেই আস্বাদন করছি। সেজন্যই মাতালদের মাতলামি ইত্যাদি যে-সব দৃশ্য থেকে মানুষের মনে কুভাবের উদয় হয়, ঠাকুর তা দেখে সমাধিস্থ হ'য়ে যাচ্ছেন। এই হ'ল বৈশিষ্ট্য। সাধনার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছলে মন এতদূর শুদ্ধ হয় যে সর্বভাবে তাঁকে আস্বাদন করতে পারে।

আর এই সর্বভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই ঠাকুরের শরীর ধারণ। তিনি যুগের অবতার, যুগের সকলের জন্য ; সর্বভাবের সর্বপ্রকারের মানুষের জন্য তাঁর জীবন। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত কারো না কারো পক্ষে উপযোগী। যাঁর সমস্ত কাজ লোককল্যাণের জন্য তাঁর একঘেয়ে হ'লে চলবে কি ক'রে ? তিনি পাঁচরকমে ভগবানকে আস্বাদন ক'রে জগতের সমক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা দেখে মানুষ নিজের নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হ'য়ে সেদিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা পায়। তিনি যদি না দেখাতেন তা হ'লে ভরসা ক'রে সে পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

সর্বভাবের এই সমন্বয় ঠাকুরের ভিতর যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, তা বিরল দৃষ্টান্ত। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখা যায়। মহাপ্রভুও এমনি কখনো সংকীর্তন, কখনো নৃত্য করতেন ; কখনো একেবারে স্থির সমাধিস্থ বাহ্যজ্ঞান-রহিত হ'য়ে যেতেন। তাঁর

জীবনে যেমন বাহ্য, অর্ধবাহ্য আর অন্তর্দশা—তিন অবস্থা ছিল ঠাকুরের জীবনেও তেমনি ঐ তিন ভাব দেখা যায়। বাহ্য অবস্থায় তিনি ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করছেন, গান করছেন, কখনো বাক্য রুদ্ধ, ভাবে নৃত্য করছেন। আবার কখনো স্থির শান্ত শারীরিক ক্রিয়ারহিত। এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে উচ্চ-নীচ তারতম্য নেই। বিভিন্ন অবস্থায় তিনি ভগবানকে আস্বাদন করবেন, এই বৈচিত্র্যই তাঁর আস্বাদের বিষয়। বিচিত্রভাবে আস্বাদন না ক'রে ঠাকুর যদি সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে থাকতেন তাতে কিছু দোষ হ'ত না। কিন্তু তিনি সর্বভাবের সমন্বয়মূর্তি ধারণ ক'রে আবির্ভূত হয়েছেন, সকলে যাতে স্ব স্ব আদর্শের পরাকাষ্ঠা তাঁর মধ্যে দেখতে পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের এই বৈশিষ্ট্য। অন্যরকম হ'লে তাঁর এই বিশেষ প্রকাশ যেন ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যেত। সর্বভাবের এই পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবতঃ পৃথিবীতে আর হয় নি। স্বামীজী বিশেষ ক'রে এ-কথাটি বলেছেন। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এই ব্যক্তিত্ব অদ্বিতীয়। জ্ঞান, ভক্তি, যোগের এই অপূর্ব সমন্বয় জগৎ কখনো দেখেনি। অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন স্বামীজী, ঠাকুরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ এ-কথা বলছেন না, দীর্ঘকাল ধরে ঠাকুরকে পরীক্ষা ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

সীমিত মন ও ঈশ্বরধারণা

ডাঃ সরকারের সঙ্গে তার পুত্রের প্রসঙ্গে ঠাকুর আর একটি কথা বলছেন, "আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা! সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস। চাঁদা মামা সকলেরই মামা।" ঠাকুরের এ-কথাটি হিসেব ক'রে নিতে হবে। তিনি যে নিজেকে কারো কাছে গুরু ব'লে প্রতিষ্ঠা করতেন না—এর অন্তর্নিহিত ভাবটি,

কি ? তিনি এই জগতে এসেছেন সকলকে ধর্মভাব দেবার জন্য। এ-কথা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বমুখে প্রকাশ করেছেন ; এখানে তার বিপরীত কথা বলছেন একটি বিশেষ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ"—লোকে সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করে। এই 'আমি' দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই নন। কারণ, সকলে সাক্ষাৎভাবে তাঁরই সেই স্বরূপের উপাসনা করছে, এ-কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। অনেক ভক্ত সে-রূপে তাঁকে চান না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, নিজের সীমিত কোন রূপকে লক্ষ্য ক'রে ভগবান বলছেন না, 'লোকে আমাকে অনুসরণ করছে'। সর্বরূপের আবির্ভাব যেখান থেকে, যেখানে সর্বরূপ পর্যবসিত হয়. সেই রূপকে লক্ষ্য করেই এ-কথা বলছেন। এই কথাটি ঠিক মতো উপলব্ধি না করতে পারলে নানা তর্ক সংশয় মতভেদ উপস্থিত হবে। ভগবানেব এ-উক্তির তাৎপর্য হ'ল যে, তাঁর বিভিন্ন রূপকে আমরা পৃথক্ পৃথক্ বলে মনে করছি, বস্তুতঃ এ-সব তাঁরই রূপ ; বহুরূপে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। এজন্য তাঁর আর এক নাম 'বিভু', যার অর্থ—বিবিধরূপে যিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর নানা রূপের মধ্যে-কোনটি বড় বা কোনটি ছোট নয়। যিনি এক অবিভাজ্য অখণ্ড তত্ত্ব, তাঁর কোন অংশ হয় না। ভাগবতে আছে—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এসব পুরুষের অংশ বা কলা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এখানে 'অংশ' বলার তাৎপর্য এই যে, অন্যত্র প্রকাশ সব একটু একটু। সেই প্রকাশ কি বস্তুর সামর্থ্যের তারতম্যের জন্য, অথবা যারা সেই বস্তুকে উপলব্ধি করেছে—তাদের শক্তির তারতম্যের জন্য—এটা বুঝতে হবে। যারা উপলব্ধি করছে তাদের শক্তির তারতম্য আছে, সেই অনুসারে কোন একটি রূপ তাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যাঁর রূপ তিনি এই সমস্ত প্রকাশকে

ছাড়িয়ে, এই জগতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে, তাকেও ছাড়িয়ে রয়েছেন। সুতরাং যিনি সর্বব্যাপী, সকলের অন্তর্যামী, সকলকে অতিক্রম ক'রে রয়েছেন, তাঁকে সীমিত ক'রে ফেলা গুরুতর অপরাধ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ভগবানের ইতি করা যায় না। তিনি এই অবধি হ'তে পারেন, আর এর বেশী হ'তে পারেন না, এ-কথা মনে ক'রো না। তুমি যতটুকু পারো আস্বাদন কর, কিন্তু জেনো তিনি তোমার মনের গণ্ডীতে বদ্ধ হবেন না। সীমিত মন তাঁর সবটা গ্রহণ করতে পারে না। আধারের তারতম্য অনুসারে তাঁর প্রকাশের তারতম্য যুগে যুগে সর্বদা হয়। তবে যে প্রকাশ সমস্ত খণ্ড-প্রকাশকে অতিক্রম ক'রে সর্ববাপী হ'য়ে রয়েছে, সেইটিই মূল তিনি ; আর তাঁর অন্যান্য প্রকাশগুলিও তিনি, কিন্তু সেগুলিকেও তিনি ছাপিয়ে রয়েছেন। ঠাকুর ঐ-কথার উপর জোর দিতেন যে, আমার অনুভব যেখানে নেই. সেখানে যে তিনি নেই বা কোথাও অংশ হ'য়ে আছেন—তা নয়। এক-একটি ধূলি-কণার মধ্যেও তিনি পূর্ণরূপে বর্তমান, প্রতিটি বিন্দুতে রয়েছে সিন্ধু। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সিন্ধুকে সেখানে অনুভব করতে না পারায় বিন্দু ক'রে দেখছি। সিন্ধু কখনও বিন্দু হন না, সিন্ধু সিন্ধুই থাকেন। আমাদের ক্ষুদ্রতার জন্য বিন্দুরূপে তাঁকে অনুভব করতে সুবিধা মনে করি, তাতে তাঁর সিন্ধুত্ব ক্ষুণ্ন হয় না, এই তত্ত্বটি বুঝতে হবে।

ঠাকুর যে বলছেন, আমার কোনও শালা চেলা নেই, এর তাৎপর্য এই "আমি"র অর্থ এই দেহটা—খোলটা যে অর্থে লোকে তাঁকে 'আমি' বলে। তিনি বলতেন, এই খোলটা কিছু নয়. এর মধ্যে তিনি পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন। আরও বলেছেন, তা অতিক্রম করেও রয়েছেন—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'।

ভগবানের এক-চতুর্থাংশ এই বিশ্বভূতসমূহ আর এর তিন-চতুর্থাংশ অমৃতরূপে দ্যুলোকে, আমাদের নাগালের বাইরে। সুতরাং মনকে যতই

প্রসারিত করি, সম্পূর্ণভাবে তাঁকে ধ'রে ফেলা সম্ভব নয়। এ-কথাটি ঠাকুর বার বার তাঁর ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। এই দৃষ্টি দ্বারা শাস্ত্রার্থ অনুধাবন করলে কোন স্থানে তাঁর স্বরূপকে খর্ব ক'রে দেখতে হবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে যা দেখছি, যা খণ্ড-প্রকাশ, সবই তিনি। আবার, এই খণ্ড-প্রকাশকে অতিক্রম ক'রে যা আছে, তাও তিনি। ঠাকুর তাই বলতেন, তাঁকে জগতের ভিতরে দেখ, বাইরেও দেখ। তিনি পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছেন সবখানে।

তিন

কথামৃত—১।১৬।১-৩

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহেন্দ্রলাল

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রসঙ্গ কথামৃতে অনেক জায়গায় আছে, এখানেও সেই প্রসঙ্গ। ডাক্তারের বিশ্বাস—ঈশ্বর নিরাকার অনন্ত, বাক্য, মনের অতীত। বুদ্ধির অগম্য সেই ঈশ্বর যে দেহধারী সীমিত মানুষ হ'য়ে, জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক স্বীকার ক'রে আসেন, এ তিনি ভাবতে পারেন না। অবতারত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ঠাকুরের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, নিজের আদর্শকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিফলিত দেখে তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানবরূপে প্রভূত সম্মান দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে অবতার ব'লে মেনে নেবার বিরোধী ছিলেন। এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাঁর তুমুল তর্ক হ'ত। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য ছিল, কারো ভাবের হানি না ক'রে, যে যে ভাবের

ব্যক্তি, তাকে সেইভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। তবে ডাক্তারের সব কথা তিনি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করতেন না; শিষ্যদের বলতেন, 'তোরা উত্তর দে'। মাঝে মাঝে দু-একটি কথা ব'লে তাদের উত্তরকে আর একটু স্পষ্ট ক'রে দিতেন। ডাক্তার ঠাকুরকে মানুন বা না-ই মানুন, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ডাক্তারকে বুদ্ধির পিঞ্জর থেকে মুক্ত করা।

ঠাকুরের প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য বা অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য, সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর ব্যবহারে বোঝা যেত না। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্নদের চোখে খানিকটা ধরা প'ড়ত, অথবা তিনি যদি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেন তো বোঝা যেত। ডাক্তারের রাত তিনটে থেকে 'পরমহংসে'র ভাবনা সুরু হয়েছে, আর আটটা পর্যন্ত চলছে—শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন, "ও ইংরাজী পড়েছে, ওকে বলবার যো নাই যে আমাকে চিন্তা কর; তা আপনিই করছে।" ঠাকুর হাসছেন কেন? না, মহামায়া তাঁর ভিতর দিয়ে যে প্রবল আকর্ষণ চারিদিকে প্রসারিত করছেন, এটি দেখছেন আর হাসছেন। নিজের ব্যক্তিত্ববোধ বা তিনি কিছু করছেন, এ বোধ নেই; জানেন তিনি জগন্মাতার হাতের যন্ত্র, সেই যন্ত্র দ্বারা মহামায়ার খেলা দেখছেন আর হাসছেন। ডাক্তারকে দিয়ে মা এইভাবে ঠাকুরের চিন্তা করিয়ে নিচ্ছেন। ডাক্তার তাঁর অবতারত্ব মানুন আর না মানুন, তাতে কিছু আসবে যাবে না। রোগী হিসাবে দেখতে এসে তিনি ঠাকুরের ফাঁদে ধরা পড়লেন। বিশ্বব্যাপী এই জালকে অতিক্রম করা কঠিন। অর্থের ক্ষতি হচ্ছে, কর্তব্যে ত্রুটি হচ্ছে—মনে করছেন। কিন্তু এমন দুর্বার আকর্ষণে পড়েছেন, যা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না। ঠাকুরের ভাব তিনি এখন ধীরে ধীরে স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন।

এখন ডাক্তার বলছেন, 'ঈশ্বরের সব গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) আছে।' আবার রোগী দেখতে গিয়ে রোগের কথা বেশী হ'ত না। বলতেন,

'তোমার কথা বলা ভাল না। বেশী কথা বোলো না, কেবল আমার সঙ্গে বোলো।' বোঝা যায়, ঠাকুরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ আন্তরিক সম্পর্ক হয়েছে, যে ঘনিষ্ঠতার জন্য নিজের মনের দৃঢ় সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ বাধলে তার প্রতিবাদও করেছেন।

মাস্টারমশায় ডাক্তারকে ঠাকুরের অসুখের দৈনন্দিন বিবরণ দিচ্ছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তীর কথা উঠল। পূর্বদিন ডাক্তার ঠাকুরকে দেখতে গেলে মহিমা চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'আপনি ডাক্তারের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ করেছেন।' তাঁর বলার উদ্দেশ্য, ঠাকুর স্বেচ্ছায় এ-রোগ স্বীকার করেছেন, কর্মপরতন্ত্র হ'য়ে নয়। যা স্বেচ্ছাবৃত, ইচ্ছা করলেই তা পরিত্যাগও করতে পারেন। ডাক্তার ভাবলেন কোন অলৌকিক উপায়ে ঠাকুর বুঝি তাঁর রোগ সারিয়ে ফেলতে পারেন, যা তিনি জানেন না। মহিমাচরণের মন্তব্যে ডাক্তার আহত হন। তাই বলছেন, লোকটার কি তমোগুণ!...বন্ধুদের বলছেন, 'রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা সকলে তেমনি **devotee**-র মতো সেবা করছে।' লক্ষণীয়, '**devotee**-র (ভক্তের) মতো' বলছেন, '**devotee**' বলছেন না। তাঁর নিজের ভাবে তিনি দৃঢ় যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার নন, মানুষ; তাঁর আবার **devotee** বা ভক্ত কি? কিন্তু ভক্তদের সেবার তিনি প্রশংসা করতেন এবং তাদের সেবায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

অবতার ও নরলীলা

অবতার যখন আসেন, সকলকে একভাবে আকর্ষণ করেন না; নানাভাবে আকর্ষণ করেন। ভক্তদের সঙ্গে তাঁর বিচিত্র সম্পর্ক হয়। ডাক্তারের সঙ্গে ঠাকুরের এমনি এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গিরিশ-বাবুর সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক, রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে আর এক রকম

সম্পর্ক, আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে ভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধ। ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারের এই বৈচিত্র্য যাঁরা দেখেন নি, তাঁরা বুঝবেন না। গিরিশবাবু কুৎসিত ভাষায় তাঁকে গালি দিয়েছেন, ঠাকুর হেসেছেন। গিরিশবাবুকে খাবার আনিয়ে দিয়েছেন কাশীপুরে অসুস্থ অবস্থায়—চলার শক্তি নেই, কোন ক্রমে উঠে ঠাকুর কলসী থেকে জল ভরে দিয়েছেন গিরিশবাবুকে, এত স্নেহ মমতা! তিনি ঠাকুরকে অজস্র গাল দিচ্ছেন আর বলছেন, 'যা দিয়েছ, তাই পাবে। বিষ দিয়েছ, বিষ পাবে।' ঠাকুর থিয়েটারে গেছেন, গিরিশবাবু নেশার ঝোঁকে দুর্বাক্য বলেছেন, ঠাকুর হেসে চলে গেছেন। বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক বিভিন্নরূপ। নিজেকে তিনি কত রকম ক'রে প্রকাশ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাঁর ভগবত্তার প্রকাশ হয়েছে। ঠাকুরের সব পথ জানা আছে, সব পথ দিয়ে যাবার সামর্থ্য আছে। সেজন্য প্রত্যেককে বলতেন, একলা আসবি। কারণ, পাঁচজনের সামনে তাকে ঠিক তার মতো ক'রে বলা যায় না। নিজের নিজের পথে প্রত্যেককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি যে সব পথ সমাজে ঘৃণ্য, সেই সব পথকেও পথ ব'লে স্বীকার করেছেন। যদিও তাঁর সন্তানদের বলেছেন, ও-সব পথ নোংরা, তোদের জন্য নয়।

ঠাকুরের এই বৈশিষ্ট্য। যিনি পবিত্রতার মূর্তি, শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা, তিনি কি ক'রে ঐ সব পথকে স্বীকার করেছেন, এই ভেবে আমাদের মন সংশয়গ্রস্ত হয়। কিন্তু তাঁর অসীমত্ব পরিস্ফুট হয়েছে এখানেই। এই জগৎ ভগবানের রচনা। যদি তিনি পবিত্র হন, এ সবই পবিত্র। তা তো নয়। তাহলে অপবিত্রতা কোথা থেকে এল? জগৎ তিনি ছাড়া আর কোথাও থেকে আসেনি। পবিত্রতা অপবিত্রতা দুই-ই তাহলে তাঁর কাছ থেকে আসতে হবে। অন্যান্য ধর্মের প্রবক্তারা বলছেন 'ও শয়তানের কাজ।" শয়তান কোথা থেকে এল? ভগবান

থেকে না এসে থাকলে শয়তানের সঙ্গে ভগবানের সহ-অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের শাস্ত্র বলছেন যে, বিশ্বজগতের যখন স্রষ্টা তিনি, তখন কেবল ভাল বা কেবল মন্দ নন তিনি। ভাল-মন্দ সবই তিনি এবং তাঁতে গেলে ভালমন্দের দ্বন্দ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, মনুমেণ্টে উঠলে উঁচু নীচু দেখা যায় না। বেদান্তের দৃষ্টি দিয়ে না দেখলে এ বোঝা কঠিন।

পশ্চিমের নানা তীর্থ ভ্রমণ ক'রে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসেছেন ঠাকুরকে দর্শন করতে। তিনি একদা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। ঠাকুর বলতেন, যা-ই করুক ভিতরে ভক্তির বীজ রয়েছে, এক সময় না এক সময় তা ফুটে বেরোবে। বলা বাহুল্য ঠাকুরের দিব্য সংস্পর্শে এসে তাঁর ভক্তিবীজ সহজেই অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হয়েছে। নানা তীর্থ ঘুরে কি দেখলেন, মহিমাচরণের এই প্রশ্নের উত্তরে বিজয় বলছেন, 'দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা!' মহিমা বলছেন, 'ঠিক বলেছেন, আবার ইনিই ঘোরান, ইনিই বসান!' অর্থাৎ ঠাকুর নিজেকে কারো সামনে উন্মোচিত ক'রে না ধরলে কার সাধ্য সেই আবরণ ভেদ ক'রে তাঁকে চিনতে পারবে?

অবতারকে ধরা যায় না। তিনি নিজেকে এমনভাবে ঢেকে আসেন যে ঘনিষ্ঠ পার্ষদরাও তাঁকে চিনতে পারেন না। উপনিষদ্ বলছেন—

> হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
> তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ঈশ. ১৫

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের—পরমেশ্বরের মুখ (তাঁর দর্শনের দ্বার) আচ্ছাদিত। হিরণ্ময় কেন? পাত্রটির উজ্জ্বল প্রভা সেই সত্য থেকেই পাওয়া। মায়া বা জগদ্রূপে যা দেখছি, তা সেই সত্যেরই প্রকাশ। আমি সত্যধর্মী, আমার উপাস্য সেই সত্য। হে জগৎ-

পরিপোষক (পালনকর্তা) সূর্য, তুমি আমার উপলব্ধির জন্য তোমার আবরণকে উন্মোচিত কর, যাতে সত্যকে আমি দেখতে পাই। যেন ছোট ছেলে, মায়ের মুখ ঘোমটা-ঢাকা দেখে বলছে, মা, ঘোমটা খোল, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই। আমি সত্যধর্মী, সত্যকে আশ্রয় ক'রে আছি, তিনি তাঁর আবরণ উন্মোচন করুন, আমি তাঁকে দেখি। তাই মহিমা-চরণ বলছেন, 'ইনিই ঘোরান, আবার ইনিই বসান।'

ঠাকুরের সঙ্গে বিজয়ের যে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হ'ল তা ইঙ্গিতে, মানুষের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ভাষায়। সহসা বিজয় ঠাকুরের পাদমূলে পতিত হ'য়ে তাঁর চরণযুগল বক্ষে ধারণ করলেন, ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে বাহ্যজ্ঞানহীন। এই প্রেমাবেশ, অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন ক'রে ভক্তেরা কেউ স্তব করছেন, কেউ কাঁদছেন, কেউ একদৃষ্টে তাঁকে দেখছেন, কেউ গান করছেন। যাঁর যা ভাব। অনেকক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ঠাকুর লজ্জিতভাবে মাস্টার-মশায়কে বলছেন, "কি একটা হয় আবেশে ;·· আমি আর আমি থাকি না।"

(অবতার যদি সর্বদা নিজেকে ঈশ্বর রূপে ভাবেন, তাঁর অবতারলীলা করা হয় না। নরলীলায় যদি না থাকেন, তাঁর অবতীর্ণ হওয়াই তা হ'লে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। ঈশ্বরাবতারগণ সর্বদা নিজেদের ঈশ্বরাবতার ব'লে বুঝতেও পারতেন না। ভুলে থাকা কারো বেশী, কারো কম। যেখানে সেই অবতারের সর্বদা প্রকট অবস্থা দেখা যায়, সেখানে সম্ভবতঃ তাঁর জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রাহকরা তাঁর স্বরূপকে ভুলে ঈশ্বরাবতার রূপটি বেশী ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। পরিণামে নরলীলার দিকটি যেন ম্লান হ'য়ে গেছে।)

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা কালে আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, তাঁর জীবনীকার স্বামী সারদানন্দজী ঠাকুরের মানব-দিকটি সকলের সামনে খুব স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরেছেন। আর দেখাচ্ছেন, সেই

মানবরূপ আবরণের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে ঈশ্বরাবতার রূপটি প্রকট হ'য়ে পড়েছে ; তাও স্বেচ্ছায় নয়, দৈবাৎ। এখানে ঠাকুর যেমন বলছেন, 'মাঝে মাঝে কি একটা হয়'। তিনি মানবরূপে লীলা করতে এসেছেন, যখন ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে পড়েন, তখন আর সে মানবরূপ ধ'রে রাখতে পারেন না। এ-আবরণ খ'সে প'ড়ে অল্প কয়েকজন মহাভাগ্যবানের কাছে। এ-আবরণ না থাকলে নরলীলার সার্থকতা থাকত না। লীলা-প্রসঙ্গকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, অবতারকে আমাদের প্রধানতঃ দেখতে হবে মানবরূপে। সেই রূপ দেখতে দেখতে, যখন রূপটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে যাব, তখনই দেখতে পাব, সে আবরণ মাঝে মাঝে তাঁর ঈশ্বরত্বকে আচ্ছাদিত ক'রে রাখতে পারছে না। প্রকট হ'য়ে যাচ্ছে তাঁর মধ্য দিয়ে। আবেশে তাঁর আবরণ খ'সে পড়ছে। যেমন পাড়ার 'হরে' যাত্রাদলের রাজা সেজে যুদ্ধ করছে, করতে করতে রাজার পোষাক খ'সে প'ড়ল। সকলে হেসে বললে, 'আরে! এ যে আমাদের 'হরে'।' এই 'হরে'ই তার আসল রূপ, রাজরূপটি ছিল তার আবরণ মাত্র। অবতারের আসল রূপ তেমনি ঈশ্বর স্বয়ং, অবতার-রূপটি ব্যক্তি বা মানবরূপে তাঁর আবরণ। অভিনয়ের জন্য, আকর্ষণ করার জন্য, এ-ছদ্মবেশ প্রয়োজন। না হ'লে মানুষের আসরে তাঁকে নামানো যায় না। যাতে মানুষ তাঁকে ধরতে পারে, স্বরূপ সম্বন্ধে বিরাট্ ধারণা ক'রে দূরে না স'রে যায়, সেজন্য এই আবরণ দরকার। এটি খুব বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অবস্থার বর্ণনা করছেন। "এ-অবস্থার পর গণনা হয় না। গণতে গেলে ১-৭-৮ এই রকম গণনা হয়।" অর্থাৎ জগতের শৃঙ্খলা, কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুযায়ী ব্যবহার সম্ভব হয় না। নরেন্দ্র বলছেন, 'সব এক কি না!' এত ভাবের মধ্যেও ঠাকুর এই কথার ভুলটুকু সংশোধন ক'রে বলছেন, "না, এক-দুয়ের পার!" সব এক

হ'লে পর একও থাকে না। যেখানে দুই আছে, সেখানেই একের সার্থকতা। যতক্ষণ অভিনয় চলছে, এক দুই সংখ্যা আছে। অভিনয় বন্ধ হ'লে এক-দুই-এর পার। যেখানে দুই নেই, সেখানে একও নেই। স্বামীজীর কথার যে ত্রুটি, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিতে, কিন্তু ঠাকুর সেটুকুও সংশোধন ক'রে দিলেন। যেখানে দ্বৈত নেই, সেখানে অদ্বৈতও নেই। অদ্বৈত মানে দ্বৈতের নিষেধ। কিন্তু তা হ'লে সেটি কি বস্তু? এক? না, সেখানে 'এক' বললে দোষ হয়। 'এক' একটি গুণ, নির্গুণ বস্তুতে কোন গুণের আরোপ করা যায় না। এজন্য এক বলা চলে না। তাই বলছেন, এক-দুয়ের পার।

শাস্ত্র ও ব্রহ্মতত্ত্ব

ঠাকুর বলছেন, "তিনি শাস্ত্র—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের পার।" শাস্ত্রের পার কেন? না, শাস্ত্র মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করবার চেষ্টা করে। যেমন বলছেন, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্—তিনি স্থূল নন, সূক্ষ্ম হ্রস্ব দীর্ঘ নন। এই রকম নন, এই রকম নন, বলা হচ্ছে—তারপর তিনি যে কি, তা আর বলা যায় না। যেখানে 'নয়' বলা শেষ হ'য়ে যায়, সেখানে তিনি। 'নেতি নেতি বিরাম যথায়' স্বামীজী বলছেন। নিষেধের পরম্পরা যেখানে শেষ হ'য়ে যায়, সেখানেই তিনি। যেখানে তিনি প্রকাশ মাত্র, সে প্রকাশকে কি দিয়ে ব্যাখ্যা করবে? ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রকাশ-বিশিষ্ট হ'য়ে যায় এবং বিশিষ্ট হ'লে শুদ্ধ প্রকাশ হ'ল না। শাস্ত্র বলছেন, সেখানে বেদ অবেদ হ'য়ে যায়, অজ্ঞান হ'য়ে যায়। যতক্ষণ আমরা দ্বৈতরাজ্যে, ততক্ষণ বিচার চলে। ঠাকুরের অনুপম ভাষায় নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গ'লে গেল। আর কে খবর দেবে? তাঁকে চিন্তা করতে করতে যখন জীবের জীবত্ব নিঃশেষিত হ'য়ে যায়, তখন তাঁকে কে ব্যাখ্যা করবে? জীব রইল কোথায়? ব্রহ্ম পর্যন্ত

পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি শাস্ত্রের অতীত, এ-কথাটি বার বার ক'রে বলা হচ্ছে। শব্দের দ্বারা তাঁকে প্রতিপাদন করা যায় না। বেদও শব্দরাশি, তাও ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করতে পারে না, তবে দিগ্-দর্শন করিয়ে দেয়। তিনি তিন গুণের পার। সত্ত্বগুণ ব্রহ্মস্বরূপের পথ দেখিয়ে দেয়, কিন্তু সেই অবধি পৌঁছে দেবার সামর্থ্য নেই।

এ-প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, পাণ্ডিত্য নিয়ে যে আছে, সে রাজর্ষি হ'তে পারে, ব্রহ্মর্ষি নয়। "হাতে একখানা বই যদি দেখি, জ্ঞানী হলেও তাকে রাজর্ষি বলে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না।" সত্যকার জ্ঞানীর কাছে শাস্ত্র তুচ্ছ, শাস্ত্রের পারে যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাই সাধারণের কাছে শাস্ত্রের যে মর্যাদা, তাঁর কাছে তা নয়। শাস্ত্র যেন একটি চিঠির মতো। তাতে আছে "পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড় পাঠাইবে।" শাস্ত্রের কাজ ঐ-খবরটুকু দিয়ে দেওয়া। যে সাধক সে ঐ পথে চলতে আরম্ভ করে, তখন আর শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। কেবল পথ চলতে হবে।

ঈশ্বরীয় প্রকাশ ও উপলব্ধি

অবতার-প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, "মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না।" তিনি আছেন সর্বভূতে, কিন্তু সেই ঈশ্বর-স্বরূপে তো তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। সেজন্য মানুষের প্রয়োজন মেটে না। তাঁকে অবতীর্ণ হ'য়ে আসতে হয়। এক জায়গায় বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখাতে হয়। সেই শক্তির প্রকাশ দেখে মানুষ ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে। ঠাকুর 'গরুর বাঁটে'র উপমা দিয়েছেন। অবতারে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হচ্ছে। শাস্ত্র বলেন, সর্বস্থানে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ? আমরা

কি দেখতে পাচ্ছি কিছু? কিন্তু যেখানে তিনি বিশেষরূপে প্রকট, অনেকখানি প্রকাশ, সেখানে দেখলে মনে হয়, 'হ্যাঁ, ইনি ঈশ্বর হ'তে পারেন।' স্বরূপের প্রকাশ পূর্ণরূপে ধারণা না করতে পারলেও এটুকু বুঝি, এ-মানুষ আমাদের মতো নয়। শাস্ত্র-কথিত ঈশ্বরের লক্ষণ অনেকখানি এঁর ভিতর প্রকাশিত। যদি ভগবান অবতীর্ণ না হন, অথবা যদি একটি আবরণে নিজেকে ঢেকে না আসেন, অনাবরণ হ'য়ে সামনে এলে তাঁকে জানার বা ধারণা করার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? তাই তাঁর এ আবরণ।

প্রশ্ন ওঠে, যিনি এ-সবের অতীত, তাঁর কেন এ প্রচেষ্টা? এর উত্তর নেই। তিনি ইচ্ছা করেছেন—জগৎ নিয়ে এভাবে খেলা করবেন। তাই চোরও হয়েছেন, পুলিশও হয়েছেন, আবার চোর-চোর-খেলায় বুড়ীও হয়েছেন তিনি। কাউকে উদ্ধার করছেন, কাউকে বন্ধনে জড়াচ্ছেন। তিনিই বিভিন্নরূপে এই খেলা খেলছেন। এজন্য সাধক যখন তাঁকে সর্ববস্তুতে উপলব্ধি ক'রে বলেন, তুমিই ভাল, তুমিই মন্দ, তখনই তাঁর অনুভবটি পূর্ণতা লাভ করে। বুঝতে হবে—তিনিই সব হয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ প্রকাশ অবতারে।

ঠাকুর ইঙ্গিত করছেন—অবতারকে ধর। সেই অবতার এসেছেন। তাঁর পার্ষদেরাও কি সবাই বুঝতে পেরেছিলেন? পারেননি। ঠাকুর নিজেও অত স্পষ্ট ক'রে ধরা দেননি। কোথাও কোথাও, ইঙ্গিত মাত্র করেছেন। স্বামীজীর মতো বিরল কারো কারো কাছে সমস্ত আবরণ উন্মোচন ক'রে দেখা দিয়েছেন, 'দেখ্ দেখি, চিনতে পারিস কি না।' এ-রকম ক'রে ধরা না দিলে কার সাধ্য তাঁকে ধরে?

চার

কথামৃত—১।১৭।১-৪

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তিন মাস হ'ল গলায় দুরারোগ্য ব্যাধি (cancer) হয়েছে। এত অসুখ, দলে দলে লোক দর্শন করতে আসছে, অহেতুক কৃপাসিন্ধু তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, কিসে তাদের মঙ্গল হয়। ডাক্তাররা, বিশেষতঃ ডাঃ সরকার কথা বলতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু ডাক্তার নিজেই ছয়-সাত ঘণ্টা ক'রে থাকেন, মুগ্ধ হ'য়ে যান ঠাকুরের কথামৃত পান ক'রে।

মাস্টারমশায় ডাক্তারের কাছে এসেছেন ঠাকুরের খবর দেবার জন্য। এখানে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের বিষয়ে মাস্টারমশায়ের কথাবার্তা আলোচিত হয়েছে। ঠাকুরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, তাঁর সংস্পর্শে আগতদের প্রতিও ডাঃ সরকারের শ্রদ্ধা এসেছে। মাস্টারমশায়কে স্নেহভরে বলছেন, 'অনেক বেলা হয়েছে, তুমি খেয়েছ তো?' এই স্নেহবশেই বললেন, 'ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াব মনে করেছি।'

কালীতত্ত্ব

কথাপ্রসঙ্গে মা-কালীর কথা উঠলে ডাক্তার বলছেন, পরমহংসদেব কালী-উপাসক। হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ভাসা-ভাসাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত আলোচনা করেন, তাদের অনেকেরই ধারণা ঠাকুর মা-কালীর উপাসক। কথাটিতে ভুল নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা-কালী' বলতে কি বোঝেন, কি অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেন, তা অনেকেই জানেন না বা বোঝেন না। আমরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে

মা-কালীকে একটি মনে করি। মাস্টারমশায় বলছেন: 'তাঁর 'কালী' মানে আলাদা। বেদ যাঁকে 'পরম ব্রহ্ম' বলে, তাঁকেই তিনি 'কালী' বলেন।' তিনিই সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার। যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, ঠাকুর বলছেন, তখন তাঁকে শক্তি কই, আর যখন কিছুই করেন না, নির্গুণ—তখন ব্রহ্ম ব'লে কই। যিনিই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়, তিনিই সগুণ-সক্রিয়। 'কালী' কথাটির তাৎপর্য আদ্যাশক্তি, যার দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে—তিনি কালী। শক্তির বিভিন্ন প্রকাশের পশ্চাতে যে আদি শক্তি, তাঁকেই 'কালী' বলে, 'ঈশ্বর' বলে। ঈশ্বর-শব্দের অর্থ যিনি 'ঈশন', অর্থাৎ 'নিয়ন্ত্রণ' করেন, তিনিই ঈশ্বর, জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বরকে ঠাকুর বলছেন 'কালী'। আবার এই জগৎ-নিয়ন্ত্রণকারিণী আদ্যাশক্তিই অবতার হ'ন। ধর্মরক্ষা করার জন্য দেহ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হ'ন। কালী মানে আদ্যাশক্তি, যাঁর থেকে সব অবতার। শক্তির বন্দনা-গানে আছে: "তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি লয় ক'রছ, তোমা হ'তে সব অবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবদেবী।" চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যেও আছে, তিনিই এ-সব দেবদেবী হয়েছেন। সুতরাং কালী অর্থে যিনি চার হাতে অসি, মুণ্ড, বরাভয় ধারণ ক'রে আছেন, তা নয়। তাঁর বিবিধ রূপ, তাঁর শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত, আবার তাঁতেই লয় পাচ্ছে। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে 'ব্রহ্ম' ব'লে গেছেন, যোগীরা যাঁকে 'আত্মা' বলেন, ভক্তেরা যাঁকে 'ভগবান' বলেন, পরমহংস-দেব তাঁকেই 'কালী' বলেন, মাস্টারমশাই বলছেন এ-কথা।

সাধারণ লোক 'কালী' বলতে ভাবে—তিনি ভয়ংকরী এক দেবী। সংহার করেন ব'লে কেউ কেউ তাঁকে তমোগুণী বলেন। একদিকে তিনি সংহার করছেন, আর অন্যদিকে সৃষ্টি করছেন। সংহার যে মূর্তিতে, সৃষ্টিও সেই মূর্তিতে। সুতরাং সাধারণের পক্ষে কালীকে বোঝা কঠিন। হিন্দুশাস্ত্রে প্রত্যেক দেবদেবী সম্বন্ধে ধারণা এই রকম। যখন তিনি

উপাস্য, তখন তিনি পরমেশ্বর, সকল দেবতার দেবতা। আমরা প্রায়ই সে তত্ত্ব না বুঝে, বিভিন্ন দেবতাকে পৃথক্ ধারণা ক'রে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করি। বস্তুতঃ এক পরমেশ্বর বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছেন, যাঁর বিভিন্ন রূপ দিয়ে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন, তাঁকে কালী বলা হয়। চণ্ডীতে আছে:

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাঽসি মায়া। ১১।৫

তুমি বৈষ্ণবী শক্তি, অর্থাৎ সর্বব্যাপী শক্তি যে বিষ্ণু তার থেকে অভিন্ন। বিষ্ণু এখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অন্যতম নন, তিনি জগতের আদি বীজ। এইভাবে তাঁর সর্বব্যাপী পরমেশ্বরী রূপের বর্ণনা করা হয়।

কালী-প্রসঙ্গ ওঠায় মাস্টারমশায় ডাক্তারকে ঠাকুরের ভাবটি বুঝিয়ে দিলেন। ডাক্তার ব্রাহ্মভাবে ভাবিত, এ-সব দেবদেবীর তাৎপর্য বুঝতেন না।

ভক্তদের ভাবসমাধি হয়েছিল আগের দিন, ডাঃ সরকার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাই বলছেন সে প্রসঙ্গে, 'ভাব তো দেখলুম। বেশী ভাব কি ভাল?' উত্তরে মাস্টারমশায় বলছেন, 'পরমহংসদেব বলেন, ঈশ্বর চিন্তা ক'রে যে ভাব হয়, তা বেশী হ'লে কোন ক্ষতি হয় না। ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের ভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ায় তাঁদের সগুণ নিরাকার ভাবের দৃঢ়তা শিথিল হ'য়ে যাচ্ছিল। সমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন: পরমহংসদেব লোক ভাল, কিন্তু বেশী ঈশ্বর চিন্তা ক'রে মাথা খারাপ হয়েছে। তাঁর ভাবটি এই যে, সকলে ঠাকুরের কথা যেন অত বেশী গ্রহণ না করে, তাতে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি হবে। ঠাকুর একথা শুনে শিবনাথকে বললেন, 'তোমরা জড়ের চিন্তা করে মাথা ঠিক রাখলে, আর আমি চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হলাম?' শিবনাথ কোনক্রমে এড়িয়ে গেলেন।

সাধারণ লোকের ধারণা—বিষয়চিন্তায় ব্যাঘাত না হয়, এমনভাবে ঈশ্বর চিন্তা করবে। বিষয়-কর্মের হানি হ'লে, বাড়াবাড়ি বলা হয়। ঠাকুর ভাবতে বলেছেন জীবনের লক্ষ্য কি ? লক্ষ্য যদি ভগবান লাভ হয়, তা হ'লে ঈশ্বরচিন্তায় বাড়াবাড়ি কোন্‌খানে ? বিষয় মানুষের লক্ষ্য নয়। তবে যতদিন মানুষ সংসারের পাঁচজনের একজন হ'য়ে আছে ততদিন নিজের ভাবকে সংকুচিত ক'রে চলতে হয়। কিন্তু ধর্মজীবনে এই সংকোচ কল্যাণকর না হ'য়ে অকল্যাণকর হয়। ঈশ্বর-সাধনায় বাড়াবাড়ি বলে কোন বস্তু নেই।

শ্রীম-মহেন্দ্রলাল-কথোপকথন

ডাঃ সরকার ও মাস্টারমশায় গাড়ীতে উঠলেন ঠাকুরকে দেখতে যাবার জন্য। পথে কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা উঠল। বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে কত বিনয় ও নম্রতা দেখিয়েছেন—মাস্টারমশায় সে-কথা জানিয়ে বললেন, "তবে কথা ক'য়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে 'ভাব' বলে, সে-সব বড় ভালবাসেন না। আপনার মতো।" ডাক্তার সমর্থন পেয়ে বলছেন, "হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও-সব ভালবাসি না।"

যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, তাঁরাও পরস্পর সাক্ষাৎ হ'লে করজোড়ে নমস্কার করেন, এটি সৌজন্যের প্রচলিত প্রথা। ঠিক তেমনি ভক্তিভাব থাকলে তা প্রকাশের পদ্ধতি সমাজ ও দেশভেদে ভিন্ন রকম। কেউ করজোড়ে, কেউ ভূমিষ্ঠ হয়ে, কেউবা দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম করে। এগুলি ভাবের প্রকাশক মাত্র ; ভালও নয়, মন্দও নয়। তবে আন্তরিকতা ছাড়া হ'লে অবশ্যই তা দোষের।

মাস্টারমশায় সুযোগ পেলেই মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে ঠাকুরের ভাবটি উপস্থাপিত করতেন। এখানে ঠাকুরের রঙের গামলার দৃষ্টান্তটি দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, ঠাকুরের ভিতর সব রঙ আছে, সব ভাব

আছে। তাই সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি ও আনন্দ পায়। মাস্টারমশায় আরো বলছেন, 'তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝবে ?' অর্থাৎ ঠাকুরের ভাব বোঝা খুব কঠিন। সুতোর ব্যবসা না করলে সুতোর পার্থক্য বোঝা যায় না। তাঁর ভাব কিছুটা নিজের অনুভবের মধ্যে না এলে ভিতরের মহত্ত্বটি বোঝা যায় না।

এর পর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করছেন, ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা কেমন ভাবে হচ্ছে। মাস্টারমশায় জানালেন, বয়স্কদের মধ্যে একজন তদারক করেন ; তাঁর অধীনে ছেলেরা সেবা করে।

ডাক্তারের ঔৎসুক্য আছে ঠাকুরের ভক্তদের সম্বন্ধে। সেবকদের সেবার আন্তরিকতা ও গুরুভক্তি দেখে তিনি মুগ্ধ। কিন্তু এখনো সেভাবে ভাবিত হ'তে পারেননি। কখন পেরেছিলেন কি না, জানা নেই। তবে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ; পরিণামে তাঁর ভিতরে এসেছিল উদারতা, তার উল্লেখ 'কথামৃতে' পাওয়া যায়। বাস্তবিক ঠাকুরের প্রভাবে এসে তাঁকে দূরে ঠেলে রাখার সামর্থ্য, বোধ হয়, কারো ছিল না। সকলেই কিছুটা প্রভাবিত হতেন ; তবে আধার ভাল হ'লে ভাবটি দ্রুত ও গভীর ভাবে সঞ্চারিত হ'ত। যেখানে তা নয়, সেখানে ভাসা ভাসা কাজ ক'রত। কিন্তু যাঁরা আসতেন, তাঁরা কেউ তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারতেন না।

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ডাঃ সরকার শ্যামপুকুরের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার রোগী দেখতে আসতেন, কিন্তু রোগ সম্পর্কে সামান্য একটু কথাবার্তার পর অন্য প্রসঙ্গ হ'ত। আজও সেই রকম। বিবেক-বৈরাগ্যহীন পাণ্ডিত্যের অসারতার কথা বলছেন ঠাকুর। 'কথামৃতে' এই প্রসঙ্গ তিনি বার বার তুলেছেন। শুধু পাণ্ডিত্য দ্বারা বস্তুলাভ হয় না, কেবল বুদ্ধির কসরৎ হয় মাত্র। সাধন না ক'রে শুধু খবর নিয়ে রাখলে কোন কাজ হয় না। ধর্ম কথার জিনিষ নয়,

অনুভবের বস্তু। একই কথা একজন বললে মনে কোন রেখাপাত করে না; কিন্তু আর একজনের সেই একই কথা হৃদয় স্পর্শ করে। তার কারণ একজনের সাধন-সম্পদ নেই, অপরজনের তা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র

বিদ্বান্ পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে ঠাকুর ডাক্তারকে বললেন যে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মানুষের কর্তব্য কি। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো সেখানে রহস্য ক'রে বলেছিলেন, 'আহার-নিদ্রা-মৈথুন'; কিন্তু তিনি জানেন না কার কাছে এ-কথা বলছেন। পণ্ডিত এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'লে যে তাকে সম্ভ্রম ক'রে কথা বলতে হবে, ঠাকুর সে পাত্র নন। এ-সব কথাবার্তা শুনে তাঁর ঘৃণা হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। বঙ্কিম বিরক্ত হলেন না; বুঝলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এ-রহস্য করতে যাওয়া অশোভন হয়েছে। তাই পরে আবার বলছেন, 'মশাই, একবার আমাদের ওখানে যাবেন।' ঠাকুর বললেন, সে ভগবানের ইচ্ছা।

পাণ্ডিত্য পণ্ডিত কিংবা শ্রোতা কাকেও উদ্ধার করে না। পাণ্ডিত্য অহংকার বাড়ায়, পরিণামে বন্ধন আরো দৃঢ় হয়। আমরা স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, মীমাংসা জানি, কিন্তু ভবসমুদ্র পার হবার পাথেয় সঞ্চয় করি না। সাঁতার জানি না। ঠাকুর বলছেন, "তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে?······আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন!"

অহংকার ও স্বতন্ত্রতাবোধ

ঠাকুরের এটি বৈশিষ্ট্য, নিজেকে যন্ত্র ব'লে ভাবেন. অপর পক্ষে পণ্ডিত নিজেকে বক্তা ব'লে ভাবেন। ঠাকুর জানেন, এ-কথা মায়ের কথা।

তাঁর কৃপায় মূর্খ বিদ্বান্ হয়। এ-প্রসঙ্গে বগলামুখীস্তোত্রের সুন্দর শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য :

> বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি।
> ক্রোধী শাম্যতি দুর্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি ॥
> গর্বী খর্বতি সর্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রণা যন্ত্রিতঃ।
> শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥

বলছেন, বাচাল মূক হ'য়ে যায়, রাজা ভিখারী হয়, তাপদানকারী অগ্নি শীতল হয়, মহাক্রোধী শান্ত হ'য়ে যায়, দুর্জন সুজন হয়, বেগবান্ ব্যক্তি খঞ্জ হয়, সর্বজ্ঞ জড় হ'য়ে যায়—তাঁরই ইচ্ছায়। তিনি যাকে যেমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, সে তাই হ'য়ে যায়। গীতা বলছেন :

> ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮.৬১

ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং যন্ত্রারূঢ়ের মতো, কলের পুতুলের মতো তাঁর মায়ার প্রভাবে সকল প্রাণীকে ঘোরাচ্ছেন। মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সকলে চলছে ; মনে করছে আমি করছি।

এ-প্রশ্ন মানুষকে খুব বিব্রত করে, আমরা স্বতন্ত্র কিনা। ঠাকুর বলছেন, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। উপনিষদেও আছে, 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ' (বৃহ. উপ. ৩. ৮. ৯)—হে গার্গি, এই অক্ষর পুরুষের শাসনাধীন হ'য়ে সূর্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হ'য়ে নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত হ'য়ে আছে। এই রকম বিশ্বের সমস্ত প্রাণী জড় চেতন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রশ্ন ওঠে—যদি তাঁর দ্বারাই আমরা নিয়ন্ত্রিত হই, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য না থাকে, তাহলে ভালমন্দ কর্মের ফল কি আমাদের ভোগ করতে

হবে? একটা তলোয়ার দিয়ে কেউ জীবহত্যা করলে তলোয়ারের ফাঁসি হবে কি? যে তলোয়ার ব্যবহার করবে, তারই ভাল বা মন্দ ফল হবে। যন্ত্রের তো কোন দোষ-গুণ নেই। যন্ত্রকে যিনি চালাচ্ছেন, সেই যন্ত্রী সকলের ভিতর থেকে তার সঙ্গে অভিন্নরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন এবং যিনি শুভাশুভ ফল ভোগ করছেন, সেও তিনি ছাড়া আর কেউ নয়। ঠাকুর যেমন ফড়িং-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সেই রামই সর্বত্র। ঠাকুরের গল্পে সেই সাধু যেমন বলেছিলেন: যিনিই আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।

ভাল-মন্দ তিনিই করছেন, আমরা ভুগি আমাদের অহংকার-বিমূঢ়তার জন্য। এই 'আমি'-বুদ্ধি—আমি কর্ম করেছি, আমি ফল ভোগ করছি, এটি ভ্রান্ত জ্ঞান; তিনিই সব করেছেন, ভোগও তিনিই করছেন, এটি প্রকৃত জ্ঞান। ব্রাহ্মণের গো-হত্যার গল্পের মতো আমরা ভাল কাজ করলে বলি, আমি করেছি, আর মন্দ কিছু করলে নিজের দোষ স্খালনের জন্য বলি, তিনি করাচ্ছেন। কষ্টভোগের সময় বলি, তিনি কেন কষ্ট দিচ্ছেন; সুখের সময় বলি না তো, কেন তিনি সুখভোগ করাচ্ছেন। তখন ভুলে যাই। এই আমাদের মনের মধ্যে দ্বিমুখী ভাব—ভাবের ঘরে চুরি। আমাদের অন্তরেও তিনি, বাইরেও তিনি—'জো কুছ হ্যায় সো তুহী হ্যায়'। সর্বঘটে থেকে তিনিই ভোগ করছেন।

ঠাকুর নিজের সাধন-অবস্থার অনুভবের কথা একটু উল্লেখ করলেন। হঠাৎ এ-সব কথা বলার তাৎপর্য মনে হয়, ডাঃ সরকারকে কৃপা ক'রে যেন তাঁর পূর্বাবস্থার কথা জানাচ্ছেন, যাতে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারে এ-বিষয়ে কিছু তথ্য সঞ্চিত হয়। ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক মন প্রত্যক্ষ আর অনুমান ছাড়া কিছু মানে না। এ-সব আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় তাঁর কাছে রহস্যাবৃত। তাই ঠাকুর এগুলির উল্লেখ ক'রে ডাক্তারের মধ্যে নতুন তথ্য প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন—যাঁর সন্ধান তিনি পাননি।

পাঁচ

কথামৃত—১।১৭।৫-৬

ঈশ্বর সকলকে যন্ত্রারূঢ়ের মতো চালাচ্ছেন—পূর্বের এ-প্রসঙ্গ এই পরিচ্ছেদেও চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ-সব বলে কে? আমি বলি,—মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী···যেমন বলাও তেমনি বলি।···ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়-কুটো"। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন—তাঁর ইচ্ছায় সব চলছে।

কর্তৃত্ববোধ অজ্ঞানজন্য

দৈবনিয়ন্ত্রণে সব ঘটছে, না মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, দর্শন-শাস্ত্রে এ-নিয়ে প্রবল তর্ক আছে, নানাজনের নানা ব্যাখ্যা মতবাদ আছে। ঠাকুর এ-সম্বন্ধে বলছেন, যতক্ষণ আমরা তাঁর ইচ্ছাকে জানতে না পারি, আমাদের কর্তৃত্ব বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ মনে করি যে আমরা করছি। সে কর্তৃত্ব অজ্ঞানজনিত। সীমিত দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে 'আমি' অভিমান ক'রে বলি, 'আমার' কর্ম। কিন্তু অপরপক্ষে, যিনি জড়, চেতন, সর্বত্র ঈশ্বরকে অনুস্যূত পরিব্যাপ্তরূপে দেখছেন, তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব ঘটছে শুধু নয়, যাদের নিয়ে সব ঘটনা ঘটছে, তারাও তিনি ছাড়া আর কিছু নন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মোহগ্রস্ত মানুষ অন্তরালবর্তী নিয়ন্তাকে দেখতে না পেয়েই মনে করে 'আমি', 'আমার'। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে—তিনিই

কর্তা, তিনিই ভোক্তা। 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা' (বৃ. উ. ৩।৭।২৩)—তিনি ছাড়া অপর কেউ শ্রোতা, দ্রষ্টা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নেই।

জগদ্ ব্যাপারের বোধ থাকলে জ্ঞানী দেখবেন, সুন্দর এক অভিনয় হচ্ছে, যার সবগুলি ভূমিকাতেই এক পরমেশ্বর অভিনয় করছেন—সাপ হ'য়ে কাটছেন, রোজা হ'য়ে ঝাড়ছেন। ভালতে মন্দতে, শত্রুতে মিত্রতে, দুষ্টতে শিষ্টতে,—সবার ভিতরেই তিনি। তিনিই সব। এই বোধটি এলে মানুষের কর্তৃত্ববোধ চ'লে যায়, ভগবানের উপর এরূপ দোষারোপ আসে না যে, তিনি এক দুঃখময় সংসার সৃষ্টি করেছেন, যে দুঃখ-সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। এই আমরা কারা? তিনি ছাড়া আর কেউ কি? মোহাচ্ছন্ন মানুষ ভগবানের থেকে নিজেকে পৃথক্ বোধ ক'রে নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করছে এবং এ-সবের নিয়ন্তারূপে ঈশ্বরকে কল্পনা ক'রে দোষারোপ করছে। পুতুল-নাচের পুতুল যদি নিজের সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারত যে সে নিজেই নাচছে, তা হ'লে সে মনে ক'রত আমি কি সুন্দর নাচছি, লোকে তাই বাহবা দিচ্ছে। তার পিছনে যে একজন দড়ি ধ'রে নাচাচ্ছে, তখন সেই-অনুভব না থাকার জন্য মনে হয় সে নিজেকে কর্তা ভেবে প্রশংসার যোগ্য ব'লে মনে করছে।

হয় তাঁর ইচ্ছা, না হয় আমার স্বতন্ত্রতা—এ-বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে হবে। যতক্ষণ সাধন-ভজন করছি—আমার ইচ্ছা আছে বলে করছি। আমি কর্তা—এ-বোধ যার আছে, তাকেই বলা চলে—'সাধন কর'। এই অধিকার বিচার মীমাংসা মতে একটি সূক্ষ্ম বিচার। শাস্ত্র যখন বলছেন 'সাধন কর', বুঝতে হবে—তার করার সামর্থ্য বা অধিকার আছে। কর্তৃত্ব যদি থাকে, তা হ'লে 'সব ঈশ্বরেচ্ছায় হচ্ছে' বলার সার্থকতা থাকে না। বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয়েছে, 'আমি কর্তা'

-এই বুদ্ধি থাকা পর্যন্ত শাস্ত্রের নির্দেশ আমাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে। 'আমি-বুদ্ধি' যার নেই, শাস্ত্র তাকে বলবেন না—তুমি কর। আমি অকর্তা বোধ এলে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রের অধিকারের ভিতর পড়ে না। সে শাস্ত্র অতিক্রম ক'রে চ'লে গিয়েছে। 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'—তিন গুণের অতীত যে পথ বা সত্তা, সে পথে যাঁরা বিচরণ করেন, তাঁদের জন্য বিধি কোথায়, নিষেধই বা কোথায়? তাই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য ততদিনই, যতদিন গুণের অধিকারে মানুষ আছে। অর্থাৎ কর্তৃত্ব-বুদ্ধির পারে গেলে, তার উপর শাস্ত্রের অধিকার থাকে না। সে তখন যা কিছু করে, সবই তার মনে হয় ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটছে।

'আমি স্বতন্ত্র'—এ-বোধ কি ক'রে যেতে পারে? এক, আমি কর্তৃত্ব-শূন্য নিষ্ক্রিয় আত্মা—এই ভাবা। আর, ঈশ্বরই সব করছেন—এই বুদ্ধি করা। যেমন ভক্ত ভাবেন, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাটিও নড়ে না। এই দুটির—যে কোন উপায়ে যদি কারো কর্তৃত্ব বুদ্ধি চ'লে যায়, সে তখন তিন গুণের অতীত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

স্বাধীন ইচ্ছা আছে, না ইচ্ছা পরতন্ত্র? এই বিষয়টি বিচার করতে গিয়ে বিভিন্ন দুটি স্তরকে এক ক'রে ফেলে আমরা বিভ্রান্ত হই। স্বাধীন ইচ্ছা আছে যখন বলি, বুঝতে হবে আমরা যে স্তরে রয়েছি, সেখানে কর্তৃত্ব-বোধ রয়েছে। ঈশ্বরানুভূতি হ'লে 'আমি করছি' এ-বোধ থাকে না। কখনো মনে হবে না, আমি করছি। 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী' ঠাকুরের এই ছোট্ট কথাটি গভীর ভাবে অনুধাবন করার বস্তু। এ-বোধ সাধারণের হওয়া অসম্ভব। যখন সর্বত্র তাঁর অনুভব হয়, সকল কর্মের কর্তা-রূপে তাঁকে দেখা যায়, তখন নিজের আমিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি ব'লে যাকে মনে করেছিলাম, তখন দেখা যায় সেখানে তিনি আছেন, আমি নেই।

এ-অবস্থা অনুভব-সাপেক্ষ। যুক্তির দ্বারা আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নি মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে চলে, না তাঁর কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে। কারণ, যার প্রত্যক্ষ অনুভব হচ্ছে যে সে স্বাধীন, তার অনুভবকে যুক্তির দ্বারা, অনুমানের দ্বারা বাধিত করা যায় না। আবার যিনি দেখছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় সব ঘটছে—তাঁর এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না। মন বুদ্ধি শুদ্ধ হ'য়ে আত্মার অনুভূতি না হওয়া অবধি এই সত্য উপলব্ধি হবে না। সুতরাং, তর্ক স্বাভাবিক।

ডাক্তার সরকার বলছেন: আমরা যা কিছু করি, কর্তব্য ব'লে করি; আনন্দের জন্য নয়। তার মধ্যে আনন্দ আছে ব'লে নয়। ডাক্তার বলতে চান যে, আনন্দকে লক্ষ্য ক'রে কাজ করতে যাই না। Hedonist বা সুখবাদী দার্শনিক বলেন যে আমাদের কর্তব্যের প্রেরণা যোগায় আনন্দ। সুখ বা আনন্দকে তাঁরা কর্মের প্রেরক ব'লে মনে করেন। কেউ কেউ বিপরীত যুক্তি দেন—আনন্দ লক্ষ্য নয়। এই সব বিচারের সিদ্ধান্ত কি হবে? মানুষ নিজের প্রবণতা অনুসারে একটি বা অন্যটিকে পছন্দ করে।

স্বাধীন ইচ্ছা ও ঠাকুরের অভিমত

এর মাঝামাঝি একটা কথা আছে। ঠাকুরও বলেছেন, একেবারে স্বাধীন না হলেও মানুষের খানিকটা স্বাধীন ইচ্ছা তিনি দিয়েছেন। সেই অনুসারে সে কাজ করে, কিন্তু যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। যেমন খুঁটিতে বাঁধা গরু, যতদূর তার দড়িটা যায়, সে ততদূরই ঘোরাফেরা করতে পারে, তার বাইরে যেতে পারে না। ঠাকুর এ-দৃষ্টান্ত অন্যত্র দিয়েছেন। তিনি এ ও বলেছেন যে, মালিকের ইচ্ছা হ'লে দড়িটা আর একটু লম্বাও ক'রে দিতে পারেন। অর্থাৎ স্বাধীনতার সীমা

বাড়তে পারে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আপেক্ষিকভাবে স্বাধীনতার কথা বলা হ'ল, পূর্ণ স্বাধীনতা আছে কি না, এ-কথা বলা হ'ল না। কর্তুমকর্তুমন্যথা বা কর্তুংসমর্থঃ।

শেষকালে, বিচারের পর মাস্টারমশায় স্বগত বলছেন, "পরে আনন্দ কি সঙ্গে সঙ্গে কারো মনে আনন্দ হয়, বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য হ'লে, Free will (স্বাধীন ইচ্ছা) কোথায়?" অর্থাৎ আনন্দ-বাদীরও স্বতন্ত্রতা রক্ষা হ'ল না। আনন্দের দ্বারা তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে গেল। সেই আনন্দকে ঈশ্বরস্বরূপ ধ'রে নিলে দেখা যায়, তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত ঠিক তাই। খুঁটিতে বাঁধা গরুর কথা আপেক্ষিক ভাবে বোঝানোর জন্য বলছেন। নিয়ন্ত্রণের ভিতরও কিছুটা স্বাধীনতা আছে, না হ'লে ধর্মোপদেশ কাকে করা হবে? উপদেশ শুনে কেউ কাজ করতে পারে, তাই শাস্ত্র উপদেশ দিচ্ছেন। ডাক্তার প্রথমেই ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'তুমি ব'কে ম'রছ কেন?' ঠাকুরের উত্তরটি ভারি সুন্দর। বলছেন: আমি ব'কে ম'রছি, কে বললে? আমি যন্ত্র। যন্ত্র যিনি চালাচ্ছেন, দায়িত্ব তাঁরই, যন্ত্রের নয়।

চিকিৎসক ও সেবা

প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তারী কর্মের কথা উঠল। এ-বিষয়ে ঠাকুর বলছেন,—"যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক'রে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ।…ডাক্তারী কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা হয়, তা হ'লে খুব ভাল।" মানুষ বিপদে পড়েছে, ডাক্তার তাকে চাপ দিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এ-ভাবে উপার্জিত অন্ন অশুদ্ধ, তাই ঠাকুর তা গ্রহণ করতে পারতেন না। তবে সবার সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য নয়। ঠাকুর বলছেন, যারা সেবাবুদ্ধিতে এ-কাজ করে, তাদের

কাজ মহৎ। বস্তুতঃ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে যে কাজ করা হয়, তা নীচ কাজ। আর অপরের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে করা হ'লে তা হয় উত্তম কাজ। সংসারের কোন কাজের উচ্চ-নীচ ভাল-মন্দ বিচারের এই একটিই কষ্টিপাথর। ডাক্তার—মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব-সেবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে ঠাকুর বলছেন, "জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ।" ভাব হচ্ছে—নিঃস্বার্থভাবে জীবের কল্যাণকর কাজই শ্রেষ্ঠ।

বিজয়কৃষ্ণ ও স্বামীজীর দর্শন

বিজয় এসেছেন। ভক্তদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বিজয় বলছেন, "কে একজন আমার সঙ্গে সদা-সর্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে।" নরেন্দ্র বললেন, "Guardian Angel-(রক্ষাকর্তা দেবদূত) এর মতো।" অর্থাৎ বিজয়কে যেন কেউ পাহারা দিচ্ছে, ঠিক পথে পরিচালিত করছে। বিজয় বলছেন, "ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে।" ঠাকুর সহাস্যে বলছেন, "সে তবে আর একজন।" নরেন্দ্রনাথ বলছেন, "আমিও এঁকে নিজে অনেক বার দেখেছি।"

স্বামীজী যে ঠাকুরকে অনেকবার এ-ভাবে দর্শন করেছেন, অন্য সময়েও তা বলেছেন। নরেন্দ্র বাড়ীতে রাত্রে পড়াশোনা করছেন, সব বন্ধ; সেখানে ঠাকুর উপস্থিত। তাই বলছেন, "কি ক'রে বলবো আপনার কথা বিশ্বাস করি না।" শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহ থাকাকালীন ও দেহ চলে যাবার পরও বহুবার স্বামীজী তাঁর দর্শন ও উপদেশ পেয়েছেন। এমন-কি, তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুও ঠাকুর ব'লে দিয়েছেন। ঠাকুর যে ব'লে দিয়েছেন স্বামীজী তা বলেননি; বলেছেন একজন এসে ব'লে দিত।'

ঠাকুর এবং স্বামীজীর চরিত্র পরস্পরের পরিপূরক। ঠাকুরের ভিতরের অগাধ শক্তি স্বামীজীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এই যে ভগবানের আবির্ভাব এবং তাঁর সহকারীরূপে স্বামীজী এসেছেন, এ এক লোকোত্তর ঘটনা। আমাদের মানববুদ্ধি একে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এইজন্য যাকে বুঝতে পারি না, তাকে কতকটা বিশ্বাস করতে হয়।

ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হবার আগে দেবতাদের তাঁর কাজে সহায়তার জন্য অবতীর্ণ হ'তে বলেছেন। ঠাকুর যেমন বলেছেন, 'কলমীর দল'—একটিকে টানলে সমস্ত দল উঠে আসে। তাঁরা যেন একটি গোষ্ঠী; পরস্পরের সম্বন্ধ লোকাতীত, জীব-কল্যাণের জন্য তাঁদের আবির্ভাব। 'বাউলের দল, তারা এল, নাচল, গাইল, চলে গেল।' জগতের লোক কেউ তাদের আভাসে চিনল, কেউ চিনল না। কিন্তু তাঁদের কাজের প্রভাব দীর্ঘকাল ধ'রে চলতে থাকে। স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুরের স্থূলদেহাবসানের পর তাঁর বিপুল শক্তি কাজ করছে জগৎ জুড়ে। স্থূলদেহে সে শক্তি যেন অপেক্ষাকৃত সীমিত থাকে, দেহত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহে সে কাজ জগৎ জুড়ে চলতে থাকে। তিনি করেন, তাঁর সহকারীরাও করেন। নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটলেও স্বামীজী তাঁর উপর জোর দিতে বলেন নি। কারণ, অলৌকিকতা তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তাতে মন দুর্বল হয়, সেখানে বুদ্ধি কাজ করে না; অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে।

স্বামীজী বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন, 'আমিও এঁকে অনেকবার দেখেছি।' এ-সভা অনেকটা অন্তরঙ্গের সভা। নিজের প্রত্যক্ষীভূত বস্তুকে অবিশ্বাস করা যায় না। প্রত্যক্ষ অনুভব ছিল ব'লে বিজয়ের কথা স্বামীজী অবিশ্বাস করতে পারেননি। মনে রাখতে হবে, এ-সব সত্ত্বেও তিনি এর উপর জোর দিয়ে চতুর্দিকে প্রচারের বিরোধী ছিলেন। এজন্য তিনি ভক্তদের বলতেন যে, ঠাকুরের এই ঘটনা অবাস্তব নয়, তবে এর উপর জোর দিয়ে প্রচার ক'রো না।

সে-সময়ে প্রচার করা হয়নি, এখনো বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। কোন কোন ঘটনা লীলাপ্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে, তাও খুব সংযত-ভাবে। আমাদের বিচার বুদ্ধিভিত্তিক হ'ক—স্বামীজী এটাই চেয়েছিলেন।

ছয়

কথামৃত—১।১৭।৫

অহৈতুকী ভক্তি

শ্যামপুকুরের বাটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্তদের অহৈতুকী ভক্তি কি বোঝাচ্ছেন। এই ভক্তিতে ভক্তের কাছে ভগবানই একমাত্র কাম্য। অন্য কামনা মিশ্রিত ভক্তি শুদ্ধাভক্তি নয়। অহল্যা এবং নারদের দৃষ্টান্ত দিলেন ঠাকুর। বললেন, "ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায় আর কিছু ধন মান দেহসুখ—কিছুই চায় না। এরই নাম শুদ্ধাভক্তি।"

শাস্ত্রে এ-সম্বন্ধে বিচার ক'রে বলা হয়েছে, আমরা বিষয়কে ভালবাসি আমাদের প্রিয় ব'লে। ঘরবাড়ী আমার ব'লে ভালবাসি। মা সন্তানকে ভালবাসেন 'আমার সন্তান' ব'লে। এইরকম সংসারের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বলা যায়, আমার আনন্দদায়ক তাই ভালবাসি। আর আমাকে কেন ভালবাসি? তার আর 'কেন' নেই। আত্মা স্বতঃপ্রিয়, স্বাভবতই আমার প্রিয়, কোনও কারণে নয়। বিষয়গুলিতে ভালবাসা আসার কারণ সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ আমাকে আনন্দ দেয়।

শুধু বিষয়ের প্রতি ভালবাসা থাকলে অপরের ঐশ্বর্যেও আমার আনন্দ হ'ত। সকলের সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা হয় না, নিজের সন্তান হওয়া চাই। এই 'আমি'র সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে জগতের সব জায়গায় মনের আকর্ষণ। সব বস্তুই পরতঃ প্রিয়—আত্মার প্রীতি

উৎপাদন করে ব'লে তারা প্রিয়। ভগবান ভক্তের প্রিয় কেন? তাঁকে ভাল না বেসে পারা যায় না। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আত্মস্বরূপ। যতক্ষণ তাঁকে আত্মা ব'লে বা ভক্তের তুষ্টিতে একান্ত আপনার ব'লে বোধ না হয়, ততক্ষণ তাঁকে আমরা উপায়রূপে দেখি, উদ্দেশ্যরূপে নয়। ভগবান আমাকে ধন, মান, ঐশ্বর্য, সন্তান-সন্ততি, দীর্ঘ আয়ু দেবেন, আমার যোগক্ষেম তিনি রক্ষা করবেন ব'লে তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত তাঁকে কোন কারণ ছাড়াই 'আত্মার আত্মা'-বোধে ভালবাসে। এই হ'ল অহৈতুকী ভক্তি—উদ্দেশ্যরূপে তাঁকে ভালবাসা। ঠাকুর বলছেন যে. এই ভক্তিতে একটু আনন্দ হয়, তা কি ক'রব?

এটি ভাববার কথা। আনন্দ পাই ব'লে ভালবাসি, না ভালবেসে আনন্দ পাই? দুটির প্রভেদ আছে। ভালবেসে আনন্দ পাই যেখানে, সেখানে ভালবাসার কোন কারণ নেই। যেহেতু তিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসে, আনন্দ পাবার জন্য ভালবাসা নয়। ভক্তিমতী কুন্তীর প্রার্থনা ছিল, 'হে ভগবান. আমাকে সর্বদা দুঃখ দাও, যাতে সবসময় তোমাকে স্মরণ করতে পারি।' দুঃখ প্রার্থনা শুধু ভগবানকে স্মরণ করার জন্য। আনন্দ নয়, ভগবানই সেখানে উদ্দেশ্য। আনন্দ সেখানে প্রত্যাশিত বা আকাঙ্ক্ষিত নয়, অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর সঙ্গে এমনি আসে। আনন্দ হ'ল ভালবাসার সমধর্মী এমনই এক বস্তু। ভক্ত তার লোভে ভগবানকে ভালবাসে না।

আমাদের কর্মের প্রেরণা যোগায় তার পশ্চাৎবর্তী আনন্দ। এ-বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই বলেন. আনন্দটি আমাদের লক্ষ্য নয়। একটা আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করলে আনন্দ আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই আনন্দকে লক্ষ্য ক'রে আমরা আদর্শের দিকে চলি না। আনন্দ আমাদের প্রেরক নয়,

প্রেরক হ'ল সদ্‌বুদ্ধি। এই সদ্‌বুদ্ধির প্রেরণা সেদিকে নিয়ে যায়, তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে আসে আনন্দ। সেই কথাই ঠাকুর বলছেন যে একটু আনন্দ আসে তো কি ক'রব। ভাব হচ্ছে এই, আমি কি ঐ আনন্দের অন্বেষণ ক'রে তাঁকে চেয়েছি? তা চাইনি!

শ্রীরামকৃষ্ণ অহল্যার প্রার্থনার উল্লেখ ক'রে বোঝাতে চাইছেন যে ভগবৎপ্রাপ্তি ছাড়া ভগবানকে ডাকার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। অহল্যা বলেছিল, "হে রাম! যদি শূকর যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না।" অন্য কিছুই চাইবার নেই অহল্যার, শুধু ভগবান। এর নাম শুদ্ধাভক্তি।

নারদের ভক্তির কথা ঠাকুর বলছেন। নারদ চেয়েছিলেন শুদ্ধাভক্তি। আর বলেছিলেন, "যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।" প্রশ্ন উঠতে পারে এই তো চাওয়া হ'ল, তাহলে শুদ্ধাভক্তি কোথায়? ঠাকুর বলেছেন, ভক্তি-কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি তো তাঁকে নিয়ে। চাওয়া মানুষকে ভগবানের থেকে পৃথক্ ক'রে দেয়। আর এ-চাওয়া তো ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। তাই এতে কোন দোষ নেই। এ নিয়ে ঠাকুর বেশ বলেছেন, মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়; হিঞ্চেশাক শাকের মধ্যে নয়। ঠাকুর বলছেন যে, "আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ।" এই আনন্দ ভগবানের সঙ্গে জীবকে অভিন্ন ক'রে দেয়।

যন্ত্ররূপে কর্মানুষ্ঠান

ঠাকুর বলছেন, "ওর উপর আর একটি অবস্থা আছে। বালকের মতো যাচ্ছে—কোনও ঠিক নাই; হয়তো একটা ফড়িং ধরছে।" ভাব হচ্ছে, এই রকম বালক (অবশ্য উপমা মাত্র) কোন উদ্দেশ্য নিয়ে

কিছু করে না। ভাগবতে এর দৃষ্টান্ত বিশেষ ক'রে শুকদেব। ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে যন্ত্রের মতো তিনি চলছেন। ঠাকুরের একটি কথা আছে, 'এবার বাউল বেশে আসব!' যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন। ভিতরে অভিমান অহঙ্কার কিছু নেই! সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছেন। শুকদেব যখন চলেছেন, নিজে যেন চলছেন না। ভগবৎ-ইচ্ছায় চালিত হচ্ছেন। যখন উপদেশ দিচ্ছেন ভগবৎ-প্রেরিত হ'য়ে উপদেশ দিচ্ছেন। বর্ণনা আছে, পরীক্ষিতের মৃত্যু আসন্ন। সাত দিন বাকী আছে। যজ্ঞ হচ্ছে, অবিরাম ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হচ্ছে। শুকদেব চলেছেন, পিছনে ছেলের দল পাগল ভেবে গায়ে ধুলো ছুঁড়ছে, খেয়াল নেই। এই ভাবে পরীক্ষিতের সভায় উপস্থিত হয়েছেন দৈবপ্রেরিত হ'য়ে। মুনি-ঋষিরা করজোড়ে উঠে দাঁড়ালেন, যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিও দাঁড়িয়ে আছেন, তখন ছেলের দল নিরস্ত হ'ল। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। দেহ সম্পর্কে উদাসীন এই শুকদেব ভগবৎ-প্রেরিত হ'য়ে সব কিছু করেন, নিজের ইচ্ছায় নয়।

এই যে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে যন্ত্ররূপে তাঁর কাছে দিয়ে দেওয়া, যে সম্পূর্ণরূপে অহং দূর করেছে, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। ভগবান লাভ না হ'লে, চেষ্টা ক'রে গ'ড়ে পিটে এ-অবস্থা হয় না। শাস্ত্র সাধন হিসাবে নির্দেশ দিয়েছেন—তাঁর উপর নির্ভর কর। এটি সাধনের কথা। সাধন করতে করতে স্বভাবে পরিণত হ'লে তখন আর কিছু করার নেই।

তাঁর দ্বারা যন্ত্রচালিত হ'য়ে কাজ করা—এটি অবতার পুরুষ বা ঈশ্বর তত্ত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর পক্ষেই সম্ভব। শাস্ত্র বলছেন, জ্ঞানীর পক্ষে অহংকার থাকার কথা নয়। তবে পূর্ব কর্মের যে লেশ থেকে যায়, সেটুকুর দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে তিনি কাজ করেন। কিন্তু 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি।' যাদের সমস্ত কর্ম ক্ষয় হ'য়ে গিয়েছে, তাঁদের কোন্ কর্ম চালাবে? প্রারব্ধ নয়, সেখানে তিনি নিজেকে চালান না, কর্মও

তাঁকে চালায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁকে চালায়। এঁর দ্বারা লোক-কল্যাণ হবে, লোক কল্যাণের যন্ত্ররূপে ঈশ্বর তাঁকে রেখেছেন।

আমাদের বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের নিরভিমানতা, আর ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে যিনি আছেন, তাঁর নিরভিমানতা, এর মধ্যে প্রভেদ অনেক। একজন সাধনের সাহায্যে অহংকে দূর করবার চেষ্টা করছে, অপর জন অহং থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়ে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে কাজ করছেন।

দাস্যভাব

ঠাকুর বলছেন, "ডাক্তারের মনের ভাব কি বুঝেছ? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও যেন অসৎ কাজে মতি না হয়। আমারও এই অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে।"

ঈশ্বরকে প্রভু আর নিজেকে দাস—এই দৃষ্টিতে দেখা, দাসভাবে প্রার্থনা করা। দাসকে শুভপথে, কল্যাণের পথে চালাও—একে দাস্যভাব বলে।

দাস্যভাব ভগবান লাভের একটি উপায়। ঠাকুর জগদ্‌-গুরু, সব ভাব তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—সব ভাবের সাধনা তিনি করেছেন। জগন্মাতা তাঁকে পূর্ণাঙ্গ একটি যন্ত্র ক'রে জগতের কল্যাণ করবেন; ধর্মজগতের বিভিন্ন পথের পথিকদের পথনির্দেশ তিনি দেবেন। তাঁর মধ্যে তাই বিভিন্ন ভাবের পূর্ণ-বিকাশ। এই ভাবগুলির এক-একটিকে পরপর অতিক্রম করে যে যেতে হয়, তা নয়। যে-কোন একটি পথ ধ'রে ভক্ত ভগবানের আস্বাদন, তাঁর পূর্ণ অনুভূতি লাভ করতে পারে। রুচিভেদে সাধক তাঁকে বিভিন্ন ভাবে আস্বাদন করতে চায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যেন অফুরন্ত ক্ষুধা, সব ভাবে সাধন ক'রে তাঁকে আস্বাদ করেছেন।

ত্রিগুণ ও সাধক

ঠাকুর বলছেন, "যদি কারো শুদ্ধ সত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পায়।" কারো কারো ক্রমশঃ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোগুণ মিশ্রিত সত্ত্ব, তাতে সৎকর্মের প্রবৃত্তি হয়। এ-সবের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ সে শুদ্ধসত্ত্বে পৌঁছয়। এ-কথাও বলছেন, "জগতের উপকার—এই সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন।" এ-বুদ্ধিটি আমাদের রাখতে হবে, আমরা কতটুকু যে জগতের উপকার ক'রব? রজোগুণের প্রভাবে মনে এই ধারণা আসে, এটি ক'রব, সেটি ক'রব। সকলকেই কর্ম করতে হবে। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে রজোমিশানো সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। রজোগুণ, তারপর রজোমিশানো সত্ত্ব, তারপর শুদ্ধসত্ত্ব—এ-ভাবে মানুষ এগিয়ে যায়।

যে অবস্থায় আমরা আছি, আমাদের উপযোগী যা, তাই করতে হবে। গোড়াতেই যদি বলি, সকলেই আমরা শুদ্ধসত্ত্ব অনুসরণ ক'রে চ'লব, ভগবানের কাছে কিছু চাইব না, তা বললেই কি পারি? পারি না। চেষ্টা করতে গিয়ে প্রতিপদে চেষ্টা ব্যাহত হয়। কারণ, আমরা বাসনাশূন্য হইনি। শাস্ত্র বলেছেন, শুদ্ধসত্ত্ব বা অহৈতুক কে হবে?—যে তাঁকে আশ্রয় করেছে, সে-ই। তা হ'লে অহৈতুকী ভক্তির উপদেশ কেন?—লক্ষ্য কি, তাই জানিয়ে দেওয়া। সেখানে আমাদের যেতে হবে, সেই অবস্থায় আমাদের পৌঁছতে হবে। এজন্য আদর্শকে সামনে তুলে ধ'রে বলছেন, এক পা এক পা ক'রে তোমাকে এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। সিঁড়িটি প্রয়োজন, এ-দিয়ে আমরা ছাতে উঠব। তাই লক্ষ্য জানা প্রয়োজন, না হ'লে, এক-দু ধাপ উঠেই ব'লব, "বাঃ বেশ অনেক হয়েছে।" ঠাকুর বলছেন—কাঠুরিয়ার প্রতি ব্রহ্মচারীর উপদেশ, "এগিয়ে যাও।"

সাত

কথামৃত—১।১৮।১-২৩

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরিশ প্রভৃতি ভক্ত উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথ মধুর কণ্ঠে গান করছেন। পর পর কয়েকটি গান শুনে ঠাকুর ভাবস্থ। এটি নিত্যদিনের ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর তাঁকে গান গাইতে বলতেন। তাঁর মধুর ভাববিভোর সঙ্গীতে ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিমগ্ন হ'য়ে যেতেন। এজন্য বিশেষ ক'রে নরেন্দ্রের গান ঠাকুরের প্রিয় ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে বলছেন, "লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের নাম করবে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" অনেক সময় ভগবানের নাম করতেও লজ্জা-সংকোচ আমাদের বাধা দেয়। ভগবানের নাম করছি, তাতে লোকে আমাদের কি বলবে—এ-কথা মনে আসাই উচিত নয়।

ঠাকুর বলছেন, "আমি এত বড় লোক, আমি 'হরি হরি' ব'লে নাচব? বড় বড় লোক এ-কথা শুনলে আমায় কি বলবে?" এই লোকলজ্জার ভয় যেন বিশিষ্ট লোকদের এ-বিষয়ে সংকুচিত ক'রে রেখেছে, ভাবটি স্ফুরিত হ'তে দেয় না। যদিও ডাঃ মহেন্দ্র সরকার জানাচ্ছেন যে তাঁর ঐ লোকলজ্জা নেই। ঠাকুর বলছেন, "তোমার উটি খুব আছে।"

ডাঃ সরকার নিজেকে যা বোঝেন, ঠাকুর তাঁকে আরো বেশী

বোঝেন! অন্য কেউ এ-কথা বললে তিনি বিরক্ত হতেন, কিন্তু ডাঃ সরকার জানেন, ঠাকুর সকলের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁর কথার মধ্যে কোন শ্লেষ নেই।

বৃত্তিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান

ঠাকুর গভীর তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলছেন, "দেখ, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়।......তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার।......এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে কেঁদেছিলেন! রাম বললেন, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে; যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে।"

কথাটি ধারণা করা বড় কঠিন। বিচার ক'রে তত্ত্বের ধারণা করতে যাই, কিন্তু সেই ধারণাও যে অজ্ঞানের রাজ্যের ভিতর—সে কথা ভুলে যাই। শাস্ত্রে আছে, 'অত্র...বেদা অবেদাঃ (ভবন্তি)', —বেদ অবেদ হ'য়ে যায়, জ্ঞান অজ্ঞান হ'য়ে যায়। ভগবান সম্পর্কে বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যে ধারণা করি, তা ব্রহ্মজ্ঞান নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে বুঝতে হবে, সে মনের বৃত্তিকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে।

ভাষায় যাকে জ্ঞান বলে, তা মনের বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির এক এক রকম রূপ। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কোন বৃত্তির জ্ঞান নয়। মন যখন আর মন থাকে না, সে ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে যায়, তখনই তাকে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া বলে। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া মানে ব্রহ্মকে জানা নয়। যে বলে জেনেছি, সে ব্রহ্মকে জানেনি। কেন-উপনিষদ্ বলছেন :

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্। (২।১)

যদি মনে কর, তুমি ব্রহ্মকে ভাল ক'রে জেনেছ, তা হ'লে ব্রহ্ম

সম্বন্ধে অল্পই জেনেছ। ঋষি বালক তার তত্ত্ব বুঝে বলছেন, 'আমি ব্রহ্মকে জানি, তাও বলছি না; আবার জানি না, তাও বলছি না। আমি জানিও বটে, আবার জানি না-ও বটে। জানি বলতে ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় ক'রে জানি,—তাও নয়। সেভাবে ব্রহ্মকে জানতে পারি না। 'আমি জানি' মানে আমার স্বস্বরূপে তন্ময় হ'য়ে যাওয়া—এই হ'ল ব্রহ্মকে জানা। সেই স্বরূপের অনুভূতি যার হয়েছে, সে তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, যতক্ষণ আমরা ভাষার রাজ্যে আছি—ততক্ষণ মনের রাজ্যের ভিতর আছি। মনের রাজাই সবটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনের রাজ্য ছাড়িয়ে যে-তত্ত্ব, তাকে কি ক'রে ভাষায় প্রকাশ ক'রব? ভাষায় যা কিছু প্রকাশ পায়, তা আগে মনের চিন্তারূপে আসে; তারপর তাকে শব্দের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করি। কিন্তু তাঁকে মনেরও অতীত বলা হচ্ছে। কেন? "তত্র মনঃ অমনীভবতি"—তখন মন আর মন থাকে না, ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়।

এটি খুব গভীরভাবে অনুভব করার বস্তু। শব্দ বা শাস্ত্র দিয়ে, বিচার দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। কেন? বিচার—যে-বুদ্ধির সাহায্যে করছি, সে-বুদ্ধি জড়-রাজ্যেরই একটি অংশ। বুদ্ধি হ'ল মনের বা অন্তঃকরণের একটি প্রকাশ। সে-অন্তঃকরণ জড় বস্তুরই একটা রূপমাত্র—জড় ছাড়া আর কিছু নয়। অন্তঃকরণ চৈতন্যের প্রভায় আলোকিত না হ'লে তার প্রকাশ হয় না। কথাটি বিশেষ ক'রে অনুধাবনযোগ্য: অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি—সবই জড়। পশ্চাতে চৈতন্যের জ্যোতিঃ রয়েছে বলেই তারা প্রকাশিত রয়েছে। যেমন এই ঘরবাড়ী সবই আছে, কিন্তু আলো না থাকলে এ-সব তখন অন্ধকারময়—একেবারে প্রকাশশূন্য হ'য়ে থাকে। ঠিক তেমনই আমাদের মনোবৃত্তিসকল ব্রহ্ম বা চৈতন্যের প্রভায় আলোকিত না হ'লে সেগুলিও অপ্রকাশিত থাকে।

তাই বলা হচ্ছে, তিনি মনের পারে। 'যন্মনসা ন মনুতে'—যাকে মনের দ্বারা মনন বা চিন্তা করা যায় না। 'যেনাহুর্মনো মতম্' (কেন. —১।৬)—যাঁর দ্বারা মন জ্ঞাত হয়। তিনি মনকে প্রকাশ করেন, মন তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। তিনি নিত্যপ্রকাশস্বরূপ, তাঁকে প্রকাশ করবে কে? সূর্যকে প্রদীপ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। সূর্যের প্রভায় প্রদীপ স্তিমিত হ'য়ে যায়। আমাদের বুদ্ধি তাই ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না, বুদ্ধি নিজেকে নিজেই প্রকাশ করতে পারে না। ব্রহ্মকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না। শাস্ত্রের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি বেদান্তের মূলকথা।

বেদান্ত বলেন—ব্রহ্ম-বস্তু স্বপ্রকাশ, কোন জ্ঞান, বিদ্যা, ভাষা তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। এইটি বুঝলে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা আমাদের হ'তে পারে। কারণ, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (কঠ. ২।২।১৫]—তাঁর আলোকে এই সমস্ত প্রকাশিত। এই সমস্ত অর্থে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এমন-কি আমাদের মন-বুদ্ধি পর্যন্ত। এইটি ব্রহ্মজ্ঞানের সার কথা। আমরা বুদ্ধির দ্বারা যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করি, তখন কি করছি? জ্ঞান-কাঁটার দ্বারা অজ্ঞান-কাঁটা তোলার চেষ্টা করছি। ব্রহ্ম বিষয়ে যে অজ্ঞান, বিচার ক'রে ক'রে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করছি। এই চেষ্টাটি যেন জ্ঞান-কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান-কাঁটা তোলার চেষ্টা। তোলা হ'য়ে গেলে জ্ঞান-কাঁটাটিও ফেলে দিতে হয়; সেটি রাখা যায় না। অর্থাৎ, মনের শুদ্ধি ক'রে ক'রে যখন মন বা বুদ্ধি সম্পূর্ণ শুদ্ধ হ'ল, তখন সে 'বুদ্ধি' এই পর্যায়ের বাইরে চলে গেল।

ঠাকুরের কথায় শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। বুদ্ধি সম্পূর্ণ শুদ্ধ হ'য়ে গেলে কি রইল?—কিছুই রইল না। তা হ'লে কি শূন্য হ'য়ে গেল? না, বুদ্ধি যাঁর দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছিল,

তিনিই রইলেন। সেই প্রকাশস্বরূপ মাত্র রইল, বুদ্ধির লোপ হ'য়ে গেল। এই হ'ল—জ্ঞান-কাঁটাটিও ফেলে দেওয়া।

শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন

এ-জিনিষটি আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। যখন জাগতিক বিষয় বুঝি, তখন ভাবি মনের দ্বারাই তাঁকে জানা যায়। অথচ শাস্ত্র বলছেন, তা করা যায় না। মনের দ্বারা এই প্রয়াস চলবে। দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃহ. ৪।৫।৬)—শাস্ত্র এই পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁর অনুভব-প্রাপ্তির জন্য আমাদের শ্রবণ করতে হবে শাস্ত্রমুখে, সাধুমুখে। যাঁরা সে-পথের পথিক, সে-বস্তু অনুভব করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে শুনতে হবে। শ্রবণ করার পর 'মন্তব্য'—মনে মনে বিচার করতে হবে, শুধু শোনা নয়। মনঃসংযোগ ক'রে শুনলেই মনে নানা সংশয় উদিত হবে। সে-সংশয় বিচার ক'রে ক'রে দূর করার জন্য যে চিন্তা, তাকে বলে 'মনন'। শ্রবণ আগে, না হ'লে মন কি নিয়ে বিচার করবে? বিচার না ক'রে, শুধু শোনায় কোন কাজ হয় না। কর্ণকুহরে শুধু কতকগুলি শব্দ প্রবেশ করালাম মাত্র, তাতে কোন ফল নেই। মর্মে তা প্রবেশ ক'রল না। অন্তরে প্রবেশ করাতে হ'লে তাকে সংশয়ের স্তরের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে। সংশয় পথ রুদ্ধ থাকলে সাধক তত্ত্বে প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য মননের একান্ত প্রয়োজন।

সে-বিচার কি ধারায় হবে, সে-সম্পর্কে শাস্ত্রের নির্দেশ হ'ল—তত্ত্বকে জানার জন্য বিচার। বিচার মানে পাণ্ডিত্য দেখানো বা অপরের যুক্তি খণ্ডন, তা নয়। এখানে বিচার শব্দের অর্থ 'বাদ'। বাদ মানে—তত্ত্ব নির্ণয় বা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিচার, এইটি বিশেষ ক'রে বুঝতে হবে। তত্ত্বকে অনুভব করার জন্য ঠাকুর বিচার করতে খুব উৎসাহিত করতেন।

আবার অন্য এক সময়ে বিচার করতে নিষেধ করছেন। কারণ, বুদ্ধি তত্ত্বের নির্ণায়ক না হ'য়ে, তত্ত্বের আচ্ছাদক হ'য়ে যায়। এই বুদ্ধি মানুষকে তত্ত্বে পৌঁছে দিতে পারে; আবার এই বুদ্ধিই তাকে তত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারে। বুদ্ধি তখন তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য প্রযুক্ত না হ'য়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য প্রযুক্ত হয়। বুদ্ধির কৌশল করতে গেলে সে-বুদ্ধি সাহায্য না ক'রে বিপরীত কার্য ক'রে বসে, পথের বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর মাস্টারমশায়কে বিশেষ ক'রে বিচার করতে বারণ করেছিলেন। যদি বিচার করতে গিয়ে ঠাকুরের কথাকে, নিজের মতো ব্যাখ্যা করেন—হয়তো ঠাকুরের এই ভয় ছিল। তিনি শ্রীমকে দিয়ে তাঁর তত্ত্ব বিশুদ্ধ, অবিকৃতরূপে প্রকাশ করতে চান।

অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য তিনিই জানেন; তবে, এমন জোর ক'রে অন্য কাউকে বলেছেন ব'লে শোনা যায় না। মাস্টারমশায়কে দিয়ে ঠাকুর তিন সত্য করিয়ে নিয়েছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য যে বিচার, তিনি তার তীব্র নিন্দা করেছেন। এক সময়ে পার্ষদদের মধ্যে বিচার চলছে খুব, তখন ঠাকুর অনুভব করলেন, এসব কথা-কাটাকাটির জন্য হচ্ছে। তাই তিনি তখন বলছেন, এসব ভাল লাগে না।

মনের শুদ্ধিসাধন

উপনিষদে ঋষি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন। শিষ্য আবার বলতে বললেন। তিনি অন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শিষ্য আবার বলতে বললেন। এই রকম কয়েকটি ব্যাখ্যা করার পর ঋষি বলছেন, 'বৎস শ্রদ্ধৎস্ব'—শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও। শুধু তর্ক-বিচারের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। যতটুকু আমাদের জ্ঞানের পরিধি, বিচার ততটুকুই প্রকাশ করে; কিন্তু তার বাইরে যেতে পারে না। তার সীমা ঐ অনুভবের পূর্ব পর্যন্ত। যেখানে

বিচারের শেষ, সেখানে বস্তুর শুদ্ধ প্রকাশ। তার আগে পর্যন্ত মনের ছাপের ভিতর দিয়ে, মনের রঙে অনুরঞ্জিত হ'য়ে তত্ত্ব আমাদের কাছে আসছে, কিন্তু তার স্বরূপ স্পষ্ট প্রকাশিত হচ্ছে না। মনের আবরণের ভিতর দিয়ে এলে তত্ত্ব পরিবর্তিত হ'য়ে যায়। তাই শাস্ত্র বলছেন, মনকে শুদ্ধ কর।

তা হ'লে উপায় কি? শাস্ত্র একবার বলেছেন 'যন্মনসা ন মনুতে'— আবার বলছেন 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্'—দুটি বিরোধী কথা! ভগবানকে মনের দ্বারা চিন্তা করি, কারণ মন ছাড়া তাকে চিন্তা করার অন্য যন্ত্র নেই। কাজেই, যে-মনের সাহায্যে জানতে চেষ্টা করছি, সে-মনটি শুদ্ধ, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত আবরণরূপ; প্রকাশরূপ নয়। তত্ত্বকে তার স্বরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। যেমন, কাঁচের ভিতর দিয়ে কোন বস্তু দেখলে কাঁচের দোষগুণের দ্বারা সেই বস্তু প্রভাবিত হ'য়ে আমাদের সামনে আসে। কোন জায়গায় কাঁচ এমন যে, ছোট বস্তুকে বড, বড বস্তুকে ছোট দেখায়, বিকৃত দেখায়—এ-সব কাঁচের জন্য হয়। মনও যেন এই রকম কাঁচ। তার ভিতর দিয়ে আমরা বস্তুকে দেখছি। কাজেই, মনের বিকার বস্তুকে বিকৃত ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করছে। এজন্য শাস্ত্র বলছেন—মনের দ্বারা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু মন বাদ দিয়ে অন্য কিছু কি আছে, যার দ্বারা আমরা অগ্রসর হ'তে পারি? কিছু নেই। তাই শাস্ত্র বলছেন, মনের দ্বারাই বস্তু লাভ করতে হবে। তা কিভাবে সম্ভব? শাস্ত্র বলছেন, মনকে শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র কর। মনকে এভাবে ঘসামাজা, শোধন করতে করতে ক্রমশঃ মনের এমন অবস্থা হবে যে, আর তত্ত্বকে বিকৃত করতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন, উপাসকের সঙ্গে উপাস্যের কি রকম ব্যবধান জানো? যেন একটা খুব পাতলা কাঁচের ব্যবধান, মনে হয় ছুঁই ছুঁই।

ভাষাটি খুব সুন্দর, কিন্তু একটু গভীরভাবে বুঝতে হবে। খুব স্বচ্ছ কাঁচ, তবু একটা ব্যবধান থেকে যায়। যার ভিতর দিয়ে বস্তু দেখছি, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না, স্পর্শ করতে পারছি না। অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না। মনরূপ যন্ত্রের সাহায্যে করছি, কাজেই যন্ত্রের দোষে সেই বস্তু দুষ্ট হচ্ছে।

অতএব, এই মনকে শুদ্ধ ক'রে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে, যখন সেটি আর মন থাকবে না। মনের ভিতর যখন সেই পরমতত্ত্ব—যা প্রকাশস্বরূপ—সেটি মাত্র থাকে, তখন মন 'অ-মন' হয়ে যায়। তিনি স্বপ্রকাশ। মন তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, শুধু আবৃত ক'রে রাখে। মন শুদ্ধ হ'লে সেই আবরণ চলে যায়। তখন কেবল তিনিই থাকেন।

এইজন্য শাস্ত্র বলছেন, মনের সাহায্যে মনকে শুদ্ধ ক'রে তাঁকে জানতে হয়। মন যতক্ষণ যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, ততক্ষণ অবধি তিনি সেই যন্ত্রের আড়ালে। মনকে অতিক্রম করার সাধ্য আমাদের নেই। প্রখর বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য সবই বেড়ার ভিতরে। মনকে শুদ্ধ করা মানে—বুদ্ধিকে প্রখর করা নয়—তার অপবিত্রতা দূর করা। শুদ্ধ পবিত্র হ'লে সে ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে যাবে—এইটি ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং মন-বুদ্ধি-রূপ জ্ঞান-কাঁটাটি যতক্ষণ না অপসারিত হচ্ছে, ততক্ষণ বস্তু নির্ণয় হয়নি, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়নি। এইটি অনুধাবন করতে হবে।

আট

কথামৃত—১।১৮।৩

জ্ঞান এবং অজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুর এই পরিচ্ছেদে আরো বিশদ ক'রে বলছেন। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে যাকে অজ্ঞান বলি, ঠাকুর সে-দৃষ্টিতে দেখেন না। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান এবং তাঁকে না জানার নাম অজ্ঞান।

অহংকার ও জ্ঞানলাভ

ঠাকুর ডাক্তারকে বলছেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হবো কবে, আমি যাবে যবে?' 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটি অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্তা, তুমিই সব ক'রছ, আমি কেবল যন্ত্র, আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি।"

এরপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অহংকারের কথা বলছেন, "যারা একটু বই-টই পড়েছে, অমনি তাদের অহংকার এসে জোটে। ক-ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে, 'ও-সব আমি জানি'।" ঠাকুর বলছেন, যে জানে সে কি বলে বেড়ায় যে, সে জানে? অর্থাৎ, সে তখন চুপ হয়ে যায়। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা একটু পড়াশোনা করেই তাঁদের পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য ব্যাকুল। তাঁরা যে প্রশ্ন করেন, তার উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া নয়। সেই প্রশ্নের ভিতর দিয়ে কথা বলার সুযোগ ক'রে নেওয়া। এদের বলার অবস্থা, শোনার নয়। বলা কেন? নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য। ঠার আঘাত দিয়ে

বলছেন, "যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু!" অপরে বলে, সে চুপ ক'রে থাকে।

এই অহংকার-প্রসঙ্গেই বলছেন, কালীবাড়ীতে একটি মেথরানীর যে অহংকার! তার গায়ে দু-একখানা গহনা ছিল। অর্থাৎ অহংকার করার মতো কিছুই নেই, তবু সামান্য যেটুকু আছে, তা যেন তারই আছে, অন্যের নেই মনে করে --এ অহংকার। ঠাকুর অহংকার দেখলে বিরক্ত হতেন; অনেককে বলতেন, 'অহংকারের টিপি'। 'টিপি' হ'ল উঁচু জায়গা, যেখানে জল জমে না। উপদেশ কাজ করে না সেখানে। উপদেশ প্রদান করার সময় ক্ষেত্র আধার বিচার ক'রে দিতে হয়। এজন্য গীতায় শ্রীভগবান বলছেন:

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি। ১৮।৬৭

এই তত্ত্বজ্ঞান, যে তপশ্চর্যা করেনি, যে অভক্ত, তাকে দিও না। যে শুনতে চায় না, তাকে ব'লো না, আর যে ভগবদ্বিদ্বেষী, তাকে দিও না। এ কি পক্ষপাত? তা নয়। বিচার ক'রে দেওয়ার কারণ, উপদেশ কার কাছে ফলপ্রদ হবে, তা দেখা প্রয়োজন। যার গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নেই, যে এমন অভিমানী, তার ভিতর আর কিছু প্রবেশ করবে না, তাকে বলে লাভ নেই।

যীশুখ্রীষ্ট কঠিন ভাষায় বলছেন, 'Do not cast pearls before swines.' বাংলায় বলে—বেনা বনে মুক্তো ছড়ানো। বাইবেল বলছেন—শূয়োরের কাছে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই। শূয়োরের প্রীতি বিষ্ঠায়, মুক্তোতে নয়। মুক্তোর মূল্য সে জানে না। তাই গ্রহণ করতে পারবে না। শাস্ত্র সেজন্য বলছেন, অধিকারী বিচার ক'রে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করতে। যে দরিদ্র, তাকে ধন দেবে; যে ধনী, তাকে ধন

দিয়ে কি হবে? যার রোগ হয়েছে, রোগের অনুভব আছে, তাকেই ওষুধ দিলে কাজ হবে। যার রোগ নেই, বা যে মনে করে, রোগ নেই, তাকে ওষুধ দিয়ে কি হবে? সে ওষুধের মূল্য বোঝে না। এই জন্যে শাস্ত্রের বিধান—অধিকারী বিচার ক'রে উপদেশ দেওয়া উচিত। যারা অধিকারী, তাদেরই সিদ্ধি, তাদেরই ফল প্রাপ্তি হয়।

শাস্ত্রমর্ম ও বোধসামর্থ্য

অনেক সময় মনে করা হয়, যাঁদের অধ্যাত্ম জ্ঞান আছে, তাঁরা কেন সকলকে বিতরণ করেন না? বস্তুতঃ প্রকৃত জ্ঞানী জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে রেখেছেন সকলের জন্য, কিন্তু নেবার লোক কোথায়? গ্রহণ করার কেউ না থাকলে ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকলেই বা কি হবে? অপাত্রে দান হ'লে তার অপব্যবহার হবে, কদর্থ করা হবে। একই আত্মজ্ঞানের উপদেশ ইন্দ্র একভাবে, বিরোচন আর একভাবে বুঝলেন। বিরোচন অন্যভাবে বুঝে দেহ-সর্বস্ব হ'য়ে গেলেন, আর ইন্দ্র ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের অধিকারী হলেন। সেজন্য তত্ত্বজ্ঞান দেবার আগে খুব বিচার ক'রে দিতে হয়। ব্রহ্মা তত্ত্বজ্ঞান দেবার আগে ইন্দ্রকে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করিয়েছিলেন অধিকারী করার জন্য।

প্রাচীন কালে ঋষির আশ্রমে যারা ব্রহ্মচারী-রূপে যেত, গুরু তাদের প্রথমে নানারকম কায়িক পরিশ্রমের কাজ দিতেন। গরু চরানো, চাষ করা প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রম করতে দিতেন। গুরু কি তাদের ঘরকন্নার কাজ করিয়ে নেবার জন্য যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন? তা নয়। তাদের শিক্ষা গ্রহণ করবার উপযোগী মনোভাব গঠন করার জন্য। গ্রহণ করার উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি আমাদের নেই ব'লে ধর্মোপদেশে কাজ হচ্ছে না।

যীশুখ্রীষ্ট উপমা দিয়েছেন, একজন জমিতে বীজ ছড়াচ্ছে—কতকগুলি বীজ বাইরে পড়েছে, পাখী খেয়ে গেল। কতক ঘাসের ওপর পড়েছে, আগাছায় মেরে ফেললে, কতকগুলি পাথরের ওপর প'ড়ে শুকিয়ে গেল। আর কতক পড়েছে কর্ষিত ক্ষেত্রে, সেখানে ফসল ফ'লল। তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণের পরিপন্থীরূপে নানা রকমের যে উপদ্রব আছে, প্রথমে সেগুলি দূর করতে হবে। এই তত্ত্ব শ্রবণ করলেই যে হ'য়ে গেল, তা নয়। এ ইতিহাস কি অঙ্ক নয়, যে শিক্ষক এক কথায় বুঝিয়ে দেবেন? এ-জিনিষ এভাবে বোঝানো যায় না। মনের পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া তত্ত্বকথা শুনে কিছু হয় না। শাস্ত্র বার বার বলেছেন, যে শুশ্রূষু নয়, বিনয়ী নয়, সেবাপরায়ণ নয়, তাকে এ-জ্ঞান বলবে না। বিনয়ী কেন? না, গ্রহণ করার মনোবৃত্তি থাকবে তাহলে। সেবাপরায়ণ হ'লে গুরুকৃপা লাভের সামর্থ্য হবে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব গ্রহণের জন্য এগুলির একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষালাভ করতে হ'লে মাসিক বেতন দিয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষালাভ হয়। সেবাপরায়ণ হ'তে হবে না। ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, কেবল কতকগুলো জ্ঞান সঞ্চার করা নয়। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষ তৈরী করা। স্বামীজী বলতেন, Man-making, character-building education—যা দিয়ে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠন হয়—এ-রকম শিক্ষার প্রয়োজন। শুধু অশিক্ষা নয়, কুশিক্ষাতেও ভুগছি আমরা। আদর্শে আস্থাহীন হ'য়ে মূল্যবোধ হারিয়েছি আমরা। সাধারণভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য—একটা চাকরি পাওয়া, কি গবেষণাদি ক'রে নতুন কিছু আবিষ্কার করা। জীবনযাত্রা স্বচ্ছল হ'ক—ভোগের সামগ্রী সহজলভ্য হবে—এই যেন আজকের জীবনের আদর্শ। তা হ'লে সেখানে, চরিত্র-গঠনের প্রশ্ন ওঠে না।

পাপপুণ্য ও ভোগকর্তা

এবার শ্যাম বসু প্রশ্ন করছেন, "পাপের শাস্তি আছে, অথচ ঈশ্বর সব করছেন, এ কি-রকম কথা ?" প্রশ্নটি অনেকেরই মনে ওঠে। ঈশ্বর যদি সব করছেন, তা হ'লে আমার দ্বারা যে-সব অন্যায় কর্ম হচ্ছে, তাও ঈশ্বরই করাচ্ছেন, তা হ'লে আমি কেন শাস্তি ভোগ করি ? আমি যদি স্বতন্ত্র না হই, কর্মের কর্তা না হই, তা হ'লে আমাকে কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে ? ভগবান যদি আমাদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন, কর্মের ভাল-মন্দ ফল আমাদের উপর না এসে, যিনি ব্যবহার করছেন, তাঁর উপরই আসা উচিত।

এই প্রশ্নে বিচারের ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ আমি যদি ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে কর্ম করি, তা হ'লে যিনি ব্যবহার করেছেন, তিনিই ফল ভোগ করবেন। কিন্তু আমি যদি কর্তা না হই, তা হ'লে কি ভোক্তা ? আমি কর্ম করিনি অথচ ফল ভোগ করছি, এ-তো ব্যাঘাত-দোষদুষ্ট কথা। ভোগও এক রকমের কর্ম, তার কর্তা আমি কি ক'রে হবো ? কর্মের কর্তা না হ'লে, ভোগের কর্তা হবো কেমন ক'রে ?

সুতরাং যে কর্ম করছে, সে ভোগ করবে। ঠাকুর ফড়িংএর পশ্চাতে কাঠি দেওয়া দেখে বলছেন, 'রাম, তোমার নিজের দুর্গতি নিজেই করেছ।' যে কাঠিটা দিয়েছে সেও তুমি, যে ভোগ করছে সেও তুমি। যিনিই কর্তা, তিনিই ভোক্তা, এই ভাবতে হবে। তা হ'লে বৈষম্য-দোষের প্রশ্ন ওঠে না। যখন বোধ হয়, ভগবান আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন, আর আমরা ভুগছি, তখন বৈষম্যদোষ উপস্থিত হচ্ছে। ঠাকুরের সেই সুন্দর গল্পটি—ব্রাহ্মণের গোহত্যার গল্প—লীলা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইন্দ্রের প্রশংসায় বিগলিত ব্রাহ্মণ বলছেন, 'আমি করেছি, এই সব।' প্রশংসা শুনে উৎফুল্ল হয় না, এমন লোক জগতে বিরল। কারণ আমি করেছি, প্রশংসা আমার প্রাপ্য।

উপনিষদে একটি কাহিনী আছে: দেবতারা অসুরদের জয় করেছেন, তাই একটু অহংকার হয়েছে। ব্রহ্ম সর্বান্তর্যামী, তিনি সে অভিমান চূর্ণ করলেন। দেবতারা বুঝলেন যে, ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁরা জয়লাভ করেছেন।

এইভাবে যখন আমরা তাঁকে সর্ববিষয়ের কর্তা ব'লে বুঝি, তখন আমাদের অভিমান আসতে পারে না। তাই দুঃখভোগ করছি ব'লে অভিযোগ আসতে পারে না। আমি সামান্য যন্ত্রমাত্র, ভোক্তৃত্বও নেই, কর্তৃত্বও নেই। যে নিজেকে অকর্তা ব'লে জেনেছে, সে অভোক্তা বলেও নিজেকে জেনেছে। যখন বলি, আমরা কর্ম করছি না, অথচ ভোগ করছি—তখন যেন খানিকটা নিজেরা দায়িত্ব নিয়েছি, খানিকটা তাঁর ওপর ভার দিয়েছি। এ আধাআধি ভাগ চলে না। ঠাকুর আর অত বিচারের মধ্যে গেলেন না। তাঁর কথায় মনে হচ্ছে, অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছেন। বললেন, "কি তোমার 'সোনার বেনে' বুদ্ধি!" এ-কথায় যদি কারো মনে আঘাত লাগে নরেন্দ্রনাথ তাই ব্যাখ্যা ক'রে দিচ্ছেন—'সোনার বেনে' বুদ্ধি হ'ল হিসেবী বুদ্ধি, Calculating বুদ্ধি।

'আমমোক্তারী'-দেওয়া

ঠাকুর বলছেন যে, অত নিষ্ফল বিচার ক'রে লাভ কি? বলছেন, "এ-সব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা।" তুমি এ-সংসারে ঈশ্বর-সাধনের জন্য মানব-জন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তারই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কাজ কি?...আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার? তোমার পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু নিয়ে তাতে ডুবে যাও—ভাব হচ্ছে এই। ভগবৎ-সাধনের জন্য দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ ক'রে কিসে

ভক্তি, শরণাগতি হয়, তার চেষ্টা করা উচিত। শ্রদ্ধা, ভক্তি, শরণাগতির ভাব না থাকলে ঐ-রকম বিচার আসে। আমাদের বিচারের মানদণ্ড দিয়ে, তাঁর ওজন ক'রে, দোষ-ত্রুটি বিচার করছি; আমরা যেন সেই বিচারের কর্তা! আমাদের এই অকিঞ্চিৎকরত্ব না জেনে ভগবানকে বিচার করতে যাই। তাই ঠাকুর বিশেষ ক'রে বলছেন যে, অনেক জানার প্রয়োজন নেই। সামান্য একটু বুদ্ধি থাকলেই তুমি তাঁর ভজনা করতে পার।

বিচারের দিকে না গিয়েই বলছেন, "ঈশ্বরকে আমমোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন।" নিজের জীবনকে সার্থক করাই আমাদের কাজ।

বিচারের ফলে মানুষ যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সে-বিষয়ে বলছেন—"তোমাদের ঐ এক। কলকাতার লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ।' কেন না, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।" প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে আমরা আমাদের প্রতিকৃতিরূপে দেখি, আমাদের চরিত্র অনুসারে তাঁকে কল্পনা করি। বাইবেলে আছে, 'God made man after His own image. অর্থাৎ ভগবান মানুষকে তাঁর প্রতিকৃতিরূপে তৈরী করেছেন। স্বামীজী বলছেন, Man made God after his own image.—মানুষ নিজের প্রতিকৃতি অনুসারে ভগবানকে কল্পনা করেছে। আমরা ঐশ্বর্য চাই ব'লে, তাঁকে সর্বৈশ্বর্যশালী বলি। তিনি আমাদের ঐশ্বর্য দেবেন। ঠাকুর বলছেন, 'এই রোগ হ'য়ে লাভ হ'ল কি জানো? এই অসুখ দেখে অনেকে পালিয়ে যাবে।' কেন? ঠাকুর নিজেই যখন অসুখে ভুগছেন, আমাদের কি আর ভাল করবেন?

নচিকেতার তত্ত্বজিজ্ঞাসা

যমরাজ নচিকেতাকে যখন লোভ দেখাচ্ছিলেন, নচিকেতা বলছেন, 'আমি আত্মজ্ঞান চাই। মৃত্যুর পর কি জীব থাকে? আমার প্রকৃত স্বরূপ কি?'

যম তখন বলছেন, 'স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি' (কঠ. ১.১.২৩)—"তুমি যত বৎসর জীবন ধারণ করতে চাও ধনৈশ্বর্য নিয়ে ভোগসুখে থাক; কিন্তু 'মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ' (কঠ. ১.১.২৫)—মৃত্যুর পর কি হয়, এরকম প্রশ্ন ক'রো না। দেবতাদেরও এ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, 'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা' (ঐ ১.১.২১)। তুমি মানুষ, কি জানবে? তুমি বালক, ওসব গভীর দার্শনিক তত্ত্ব জানতে চেও না।"

বালক নচিকেতা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি বললেন, 'যা অনেকে জানে না এবং তুমিই দিতে পার ব'লছ, তাই দাও। ঐশ্বর্যাদি তোমার থাক, আমার প্রয়োজন নেই।'

মানুষ ঐশ্বর্যের লোভে ঈশ্বরের আরাধনা করে। যেখানে তা নেই, সেখানে ভক্তি যায় না। শাস্ত্র যেন তাই আমাদের আকর্ষণ করার জন্য বলছেন, আমরা এমন ভগবানের কথা ব'লব, যিনি তোমাকে উভয়লোকে সুখে রাখবেন। পার্থিব ঐশ্বর্যও পাবে, আবার মুক্তি কামনা করলে তাও পাবে।

শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা

ভক্তদের মধ্যেও যে পার্থিব বস্তু চাওয়া একেবারে ছিল না, তা নয়। ভক্ত সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সখা। সুদামার পত্নী কেবল বলেন, আমাদের এত অভাব, তোমার বন্ধু তো রাজা, তাঁর কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে এস না? সুদামা দ্বিধা করছেন। একদিন বন্ধুদর্শনের জন্য সুদামা গেলেন কৃষ্ণের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, সুদামা

বিগলিত ; ভগবানের চাতুরীর শেষ নেই। জিজ্ঞাসা করছেন, 'সখা, আমার জন্য কি এনেছ ?' সুদামার স্ত্রী কয়েকটি খুদের নাড়ু দিয়েছিলেন, প্রকাশ্যে তিনি তা দিতে সংকুচিত হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ খুঁজে নিয়ে তা সাগ্রহে খেতে লাগলেন। সুদামার চোখে অঝোরে ধারা ঝরছে। প্রভুর আপ্যায়নে তৃপ্ত হ'য়ে যেতে যেতে ভাবছেন, যা চাইবার জন্য আসা, তা বলা হ'ল না। আমি দীন, দরিদ্র, অতি সামান্য বস্তু এনেছিলাম, কত আগ্রহে সে গ্রহণ ক'রল—এই ভেবে সুদামা আনন্দিত হচ্ছেন। তার পরের ঘটনা—পুরাণে সর্বত্র যেমন হয়—সুদামার দুঃখ দুর্গতি দূর হ'ল। ফিরে এসে নিজের পর্ণকুটির খুঁজে পাচ্ছেন না, সেখানে প্রাসাদ, তাঁর পত্নী সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। সুদামা বিস্ময়ে বিহ্বল, 'এ কাদের বাড়ী !' স্ত্রী বলছেন, 'তোমার সখা সব ক'রে দিয়েছেন।'

ভক্ত ও মানবজন্ম

ভাব হচ্ছে, প্রয়োজন হ'লে এসবও তিনি দেন। কিন্তু এসবের লোভে যেন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব না করা হয়। ঠাকুর যেমন বলতেন, "রাজার কাছে লাউ কুমড়ো চাওয়া।" যা পেলে অন্য কিছু চাইতে হবে না, তাই চাওয়া উচিত।

এক ব্রাহ্মণ শিবের কাছ থেকে স্বপ্নে জেনে সনাতন গোস্বামীর কাছে দারিদ্র্য দূর করার প্রত্যাশা নিয়ে উপস্থিত। সনাতন বললেন, 'ঐ বালির মধ্যে স্পর্শমণি আছে, সেইটি নিয়ে যাও, তোমার অভাব দূর হবে।' সে বালি খুঁড়ে পেল সেই মণি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে :

লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।

কবিতাটি অতি সুন্দর। শেষ কালে ব্রাহ্মণ বলছেন :

যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে, এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

এ ধনে আমার দরকার নেই—ভক্তের এই কথা। ধ্রুবের মতো যদিও সকামভাবে কেউ তাঁর কাছে যায়, তাঁর এমন দিব্যপ্রভাব যে, কামনা অন্তর্হিত হয়। দিব্যজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন ভক্ত তাঁকেই চায়।

ঠাকুর বলছেন, "ভগবানের কি দোষগুণ আছে, তা বিচার না ক'রে, তোমার জীবন যাতে ধন্য হয়, তাই কর।" যে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা হবে, তিনি সেই বুদ্ধির সীমার পারে। ঠাকুর বলছেন, "হেম দক্ষিণেশ্বরে যেতো। দেখা হলেই আমায় বলতো, 'কেমন ভট্টাচার্য মশাই! জগতে এক বস্তু আছে,—মান?' ঈশ্বর লাভ যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকই বলে।"

আমরা মুখে যাবা বলি ঈশ্বরলাভ জীবনের উদ্দেশ্য, তা কতটা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস ক'রে বলি, তা ভাববার কথা। তিনিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লে, সমস্ত জীবনের ধারা কি বদলে যাবে না? যে মান-যশ ভোগৈশ্বর্যের জন্য প্রাণপাত ক'রে চলেছি, তা কি খড়কুটো মনে হবে না? ঠাকুর বলছেন, অন্তর দিয়ে বোঝ—জীবনের উদ্দেশ্য কি? দুর্লভ মানব-জীবন, এ জীবনে ভগবান লাভ পর্যন্ত হ'তে পারে।

শাস্ত্র সাবধান-বাণী উচ্চারণ করছেন :

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ (বিবেকচূড়ামণি—৩)

দেবতার অনুগ্রহ ব্যতীত এই তিন দুর্লভ বস্তু লাভ হয় না। প্রথম

মানব জন্ম, তার মধ্যে আবার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং তারপরও, আবার মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ। এই তিনটি দুর্লভ বস্তু জীবনে লাভ হ'লে তা সার্থকতায় পূর্ণ হয়। সুতরাং যে সুযোগ এ জীবনে পেয়েছি, তা আবার কতদিনে আসবে, তা জানি না। এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা যদি মনে না জাগে, সর্বদা যদি সজাগ না থাকি, সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করি, তাহলে মানুষ হ'য়ে জন্মানোর কোনও সার্থকতা নেই—ঠাকুর একথা বলছেন। ঈশ্বর লাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

নয়

কথামৃত—১।১৮।৪-৬৫

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর

এই অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্যাম বসুর আলোচনা গভীর অর্থবোধক। সূক্ষ্মশরীর সম্পর্কে Theosophy ও হিন্দুধর্মে অনেক কথা আছে।

শ্যাম বসু বলছেন, "সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?"

ঠাকুর অত আলোচনায় না গিয়ে বলছেন, "যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে!" ভাব হচ্ছে, ও সব ভেল্কিবাজি তারা দেখাতে চায় না। দেখালে তাদের মানবে? মান তাঁরা চান না। এই সব ইচ্ছে তাদের থাকে না।

শ্যাম বসুর প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর সংক্ষেপে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের

প্রভেদ বলছেন, "পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটি স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহংকার আর চিত্ত, এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দ লাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণশরীর।"

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি উপাদানে তৈরী পাঞ্চভৌতিক দেহ হ'ল স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এটি হ'ল সূক্ষ্মশরীর। ঠাকুর এখানে সংক্ষেপে বললেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট যে শরীর তা সূক্ষ্মশরীর। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সতেরটি সূক্ষ্মশরীরের অঙ্গ।

'সূক্ষ্মশরীর' মানে খুব ছোট, স্বচ্ছ বা হাওয়ার মতো—এরকম কিছু নয়। যার উপাদানগুলি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাকে দেখা যায় না, তাকে জানা যায় কি করে?

শাস্ত্র বলছেন, এগুলি যোগীদের জ্ঞানগম্য। তাঁরা দেখতে বা বলতে পারেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টি স্থূল নয়। সূক্ষ্মদৃষ্টি ছাড়া সূক্ষ্মশরীর বোঝা যায় না। 'সূক্ষ্ম' বলতে ভাবি—খুব শক্তিশালী, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যাবে। কিন্তু তাতেও দেখা যায় না। কারণ যা প্রত্যক্ষ বা যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, অর্থাৎ সাধারণভাবে বা যন্ত্রের সাহায্যে ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, তাও স্থূল, সূক্ষ্ম নয়। যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না, তাকে সূক্ষ্ম বলে। স্থূল সূক্ষ্ম সম্বন্ধে এই ধারণাটুকু পরিষ্কার রাখা দরকার। অনেক সময় বলা হয়, মৃত্যুকালে হাওয়ার মতো, জ্যোতির মতো বেরিয়ে গেল—কোথা দিয়ে যেন মহাপ্রাণ বেরিয়ে গেল! এগুলি প্রচলিত প্রবাদ মাত্র।

Christian Science-এ (খ্রীষ্টীয়-ধর্মবিজ্ঞান) Spiritualist-রা (অধ্যাত্মবাদীরা) বলেন ECTOPLASM নামক এক উপাদানে তৈরী সূক্ষ্মশরীর, সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু দেখা যায় না। Photo তোলা যায়। আমাদের দৃষ্টিতে এ-ধারণা অশাস্ত্রীয় ও ভিত্তিহীন।

স্বামীজীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, অনেক রকম ভেল্কি তারা দেখায়, এ-সম্বন্ধে আমি কোন সিদ্ধান্ত করিনি। কারণ, করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। অনেক সময় ওরা যেখানে ভূত নামায়, সেখানে এরকম ঘটনা ঘটে। ভূতের চেহারা আছে, প্রতিকৃতি ওঠে ইত্যাদি।

আমাদের শাস্ত্রেব সঙ্গে এগুলি মেলে না। মন বুদ্ধি এসব নিয়ে যে সূক্ষ্মশরীর তার কি প্রতিকৃতি নেওয়া যায়? যে জিনিষ স্থূল, তার প্রতিকৃতি তোলা যায়। সূক্ষ্মশরীরের উপাদান তাতে ধরা পড়ে না। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম ক'রে যে জ্ঞান, তা অতীন্দ্রিয়। যোগীদের দৃষ্টি অতীন্দ্রিয়। এই দৃষ্টি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর জিনিষও জানা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সূক্ষ্ম জিনিষ মানে খুব পাতলা, জল বা হাওয়ার মতো নয়। ভূত সম্বন্ধে কেউ বলে, দেখেছে; কেউ বলে, দেখেনি। যারা দেখেনি, তাদের মনে চিরদিনই সন্দেহ থাকবে। আর যারা দেখেছে, ভূতের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা তাদেরও নেই। সুতরাং এসব নিয়ে যখন আলোচনা করি, তখন চেষ্টা করি, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে। এ নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। কিন্তু তা ব'লে এগুলি অগ্রাহ্য বা অজ্ঞেয় নয়। এ-বস্তুকে জানতে হ'লে যোগীর দৃষ্টি পেতে হবে। সাধারণের দৃষ্টিতে হবে না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (১১।৮)—আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক শক্তি, বিভূতি, মাহাত্ম্য দর্শন কর।

এই দেখা যে কি রকম দেখা, তা যিনি দেখেছেন আর যিনি দেখালেন, তাঁরাই বলতে পারবেন। দিব্যচক্ষু ছাড়া কোন ভাবেই মানুষ ভগবানের বিশ্বরূপ দেখতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলছেন, মানুষ এ ভাবে দেখতে পায় না। তুমি আমার ভক্ত, প্রিয়, তাই

তোমাকে দিব্যচক্ষু দিলাম, এ দিয়ে দেখ। অর্জুন দেখেছেন, কিন্তু তিনি কি অন্যকে দেখাতে পারেন? ভগবান ইচ্ছা করলে দিব্যচক্ষু দিতে পারেন, মানুষের তা দেবার সামর্থ্য নেই। বলা যেতে পারে, ব্যাসদেব তো সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। যতদূর মানুষের সীমা, তাই তার নিজেরই চোখে পড়ে না, সে অপরকে দেখাবে কি করে?

ঠাকুর বলছেন, "যে-শরীরে ভগবানের আনন্দ লাভ হয় আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণশরীর। তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়) মুখে বলা যায় না।"

এখানে আর 'শরীর' শব্দটির প্রয়োগ নেই। ভগবানের ধ্যান চিন্তা সূক্ষ্মশরীরে হয়। আরো একটু এগিয়ে বললেন, কারণশরীরে আনন্দ সম্ভোগ হয়। 'শরীর' আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থে নয়। সেই শরীর আমাদের কল্পনার অতীত।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার দিয়ে যে শরীর তার কি হাত পা ইত্যাদি আছে? তা নয়। এটুকু বুঝতে হবে—শরীর বলা হচ্ছে, কারণ তার ভিতরেও ব্যক্তিত্ব আছে। যে ব্যক্তিত্ব অবলম্বন ক'রে ভগবদানন্দের অনুভব হয়, সে ব্যক্তিত্ব আমাদের মতো হাত, পা যুক্ত স্থূল ব্যক্তিত্ব নয়। সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্ব—বাড়ীঘর প্রভৃতি কোনো শৃঙ্খলে তাকে আবদ্ধ রাখা যায় না। ঠাকুর অনেক স্থানে বলেছেন, গোপীরা সূক্ষ্মশরীরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতেন। ভাগবতে বর্ণনা আছে, এক গোপীকে ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, তিনি সেই দেহ ত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। স্থূলদেহে যে অভিমান থাকে, তা ত্যাগ করলে স্থূলদেহ প'ড়ে থাকবে। তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। দেহে 'আমি' অভিমান করা পর্যন্ত দেহ আমার। অভিমান ত্যাগ করলে স্থূলদেহ আমাকে আটকে রাখতে পারে না। ব্যক্তিত্ব তা থেকে মুক্ত হ'য়ে যায়।

তখন সে সূক্ষ্মশরীরে ভগবানের কাছে উপনীত হ'ল। তা হ'লে, 'শরীর' মানে পঞ্চভূতে তৈরী শরীর নয়।

ভগবদ্-আনন্দের অনুভব যে শরীর দিয়ে হয়, সেটিকে বললেন কারণশরীর। কারণশরীর আরো একটু উচ্চ অবস্থা—সূক্ষ্মশরীর থেকে। সূক্ষ্মশরীর এক লোক থেকে অন্য লোক, এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। সূক্ষ্মশরীরের সপ্তদশ অবয়বের কোনটিই স্থূলবস্তু নয়। কোনো 'ভূত' তার ভিতরে নেই। কাজেই, সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট যে, সে লোকান্তরে গমন করে। তা দিয়েও ভগবদ্-আনন্দ অনুভব হয় না। সেই আনন্দ আরো সূক্ষ্মবস্তু। সেজন্য ঠাকুর বলছেন, কারণশরীর দিয়ে ভগবদ্-আনন্দ হয়। এই বিভাগটি ভারি সুন্দর, ভাববার মতো। আরো বলছেন, তিনি সকলের অতীত মহাকারণ—যার ভিতর কোন ব্যক্তিত্ব, আমি-তুমি ভেদ থাকে না। সমস্ত ভেদ, সমস্ত গুণের অতীত যে তত্ত্ব, তা মহাকারণ (তুরীয়)—তাকে আর বলা যায় না।

ঠাকুর এর আর বিস্তার করলেন না এখানে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন অবস্থার পারে চ'লে গেলে মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে যায়। সে অবস্থা তুরীয়। অন্যভাবে চতুর্থ অবস্থা বলা হয়, আসলে বলা যায় না। 'তুরীয়' মানে তিনের মধ্যে নয়। তিনের অতীত জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই তিন অবস্থার অতীত, মুখে বলা যায় না।

ঠাকুর এবার আসল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। সাধনের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলছেন, "কেবল শুনলে কি হবে? কিছু করো।" শ্যাম বসুর প্রশ্ন শুনে মনে হয়, জানবার কোন আগ্রহ নেই, শুধু তর্কের জন্য যেন জানা—অপরকে ব'লে খ্যাতি লাভ হবে। ঠাকুর বলছেন, "সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়।" এ সম্বন্ধে অন্যত্র বলেছেন, 'ও-পথ দিয়েই গেলে না, আবার বলে আমাকে বুঝিয়ে

দাও, দেখিয়ে দাও।' সাধারণ যুক্তিবাদী মানুষের এই কথা—দেখিয়ে দাও, তবে মানবো। তুমি মানো আর না মানো, যাঁরা এ-পথে চলেছেন, তাঁদের কি প্রয়োজন তোমাকে দেখাবার? জানার আগ্রহ থাকলে, তুমি চেষ্টা করো—তাঁরা পথ দেখিয়ে দেবেন—এই শাস্ত্রের বিধান।

ঠাকুর বলছেন, "তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কাকে বলে সব বুঝতে পারবে। যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করবে।" অন্যত্র বলেছেন, 'আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও।'

বাস্তবিক সে বস্তু আস্বাদন করলে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়। তত্ত্ব আস্বাদন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ হিসাব-নিকাশ, সংবাদ সংগ্রহ ক'রে যায়।

অহল্যার কথা ঠাকুর বলছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি বলেছেন, "যদি শূকর যোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।" ঠাকুর এ-প্রসঙ্গে আরো বলছেন, "আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম।" এই রকম বাসনাশূন্য হ'লে, তবে ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হয়। কেমন ক'রে প্রার্থনা করতে হবে, তিনি আমাদের তা শেখাচ্ছেন।

'ধর্মাধর্ম শুচি-অশুচি' ইত্যাদি

ধর্মাধর্মের প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, "ধর্ম কি না—দানাদি কর্ম। ধর্ম নিলেই অধর্ম ল'তে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ ল'তে হবে।" ভালমন্দ, ধর্ম-অধর্ম, শুচি-অশুচি এগুলি পরস্পরবিরোধী বস্তু। একটিকে মনে করলে, আর একটিকেও মনে করতে হবে। তাই বলছেন, এগুলি পরিত্যাগ করলে, তবে তত্ত্বের আস্বাদন হয়। আগে যেমন বলেছেন, জ্ঞান আর অজ্ঞান-কাঁটা—এ-দুটিই ভগবৎ-পথের বাধা। দুটি ফেলে দিলে তবে তাঁর আস্বাদন হয়।

শুচি অশুচির প্রসঙ্গে বলছেন. "যদি কারও শূকর মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে. সে পুরুষ ধন্য ; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—" শেষ করার আগেই ডাক্তার বললেন, "তবে সে অধম !"

ডাক্তার সরকার এবার বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রসঙ্গে যে হাস্য-রসাত্মক ব্যাখ্যা আছে. সেটির উল্লেখ করলেন। উদ্দেশ্য গম্ভীর ভাবকে কিঞ্চিৎ লঘু করা। ঠাকুরও মাঝে মাঝে এমনি করতেন।

শ্যাম বসু গৃহস্থ, তাঁর মনে সংশয়, সংসার যদি ঈশ্বরের পথে বাধা হয়। এ-প্রশ্ন অনেকেরই মনে আসে। ঠাকুর বলছেন, 'সংসার ধর্ম ; তাতে দোষ নেই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হ'য়ে কাজকর্ম ক'রবে।'

মনকে কেমন ভাবে রাখতে হবে, তা ফোঁড়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন। পিঠে ফোঁড়া হয়েছে. সব কাজ করছে. কিন্তু মন রয়েছে ফোঁড়ার টনটনানির দিকে। সেই রকম মনের টান থাকবে ঈশ্বরের দিকে, সব কাজের দিকে, সব কাজের ভিতর বারে বারেই মনে উঠবে। একটা অন্তঃপ্রবাহ চলবে, ঈশ্বরকে ভুলে যাবে না। কাজকর্ম দেখে লোকে টের পাবে না। কাজ ঠিকই চলছে। মন প'ড়ে আছে ঈশ্বরের দিকে। মনের ভাগাভাগি হলেও প্রথম অবস্থায় এটি করতে হয়। তারপর মন সম্পূর্ণ তাঁতে মগ্ন হ'য়ে গেলে আর হয়তো কোন কাজকর্ম সম্ভব হয় না। কিন্তু সে অনেক দূরের কথা। প্রথমেই যদি ভাবতে বসি, ঈশ্বরের চিন্তা করলে সংসারের কাজকর্ম কি ক'রে ক'রব, তাই ঠাকুর বলছেন,—তাঁতে মন রেখে সব কাজ করা যায়। এখানে যেমন ফোঁড়ার দৃষ্টান্ত দিলেন, কোথাও দাঁতের ব্যথার, কোথাও বা নষ্ট মেয়ের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এগুলি এমন দৃষ্টান্ত, যা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়।

থিয়োসফি ও ঠাকুরের অভিমত

শ্যাম বসু আবার থিয়োসফি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। বোঝা যাচ্ছে, তিনি আজে বাজে প্রশ্ন তুলছেন। ঠাকুর তাতে বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি পড়াশোনা ক'রে জানেননি, শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনার সময় শোনেননি। শাস্ত্রে থিয়োসফি নেই, এটি নতুন ঢেউ। তিনি এ-সম্পর্কে কিছু জানেন না, এটুকু ঠাকুর জানালেন। "যারা শিষ্য ক'রে বেড়ায় তারা হাল্‌কা থাকের লোক।" নিজেদের মতে অপরকে এনে দলবৃদ্ধি ক'রে যারা বেড়ায় তারাও হালকা থাকের লোক।

অলৌকিক শক্তি ঈশ্বরপথে চলায় কোনো সাহায্য করে না, বরং বাধাস্বরূপ হয়। "ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ভক্তি হওয়া এসব লোকের ভারী কঠিন"। ঐদিকে মনের বাজে খরচ হ'য়ে যায়। তাই ঈশ্বরে ভক্তি হয় না। বাজে কথায়, চিন্তায় ব্যাপৃত থাকায় ভগবৎ-চিন্তার অবকাশ হয় না।

স্বামীজীর একবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ধ্যান করতে করতে অনেক দূরের কথা শুনতে পাচ্ছেন। ঠাকুর তখন ধ্যান না করার নির্দেশ দিলেন। ঐদিকে পাছে মন চ'লে যায়। দূরে অপরে কি বলছে তা শুনে পরে খবর নিয়ে স্বামীজী দেখলেন যে মিলে গেল। ঠাকুর বিচার করছেন—এই দিয়ে কি ঈশ্বর লাভ হবে? আমরা কি ভগবানের পথে এগোব? তাঁর স্বরূপ বুঝব এর দ্বারা? তা যদি না পারি, এর মূল্য কি তাহলে?

শ্যাম বসু এর পর বলছেন, মৃত্যুর পর জীবাত্মা কোথায় যায়, তা থিয়োসফিতে জানা যায়। ঠাকুর বলছেন, "তা হবে। আমার ভাব কি রকম জানো? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ-সব কিছু জানি

না ; কেবল এক রাম চিন্তা করি।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব, একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কিছুই জানেন না। জানবার দরকার কি ? তাঁকে জানলে মন এমনি ভরে যায়, অন্য কিছু জানার আগ্রহ থাকে না।

আমরা যখন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমাদের নানা বিষয় জানার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁকে জানা ছাড়া আমাদের জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। উপনিষদ্‌ও বলছেন, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ' (মুণ্ডক, ২।২।৫)—অন্য চিন্তা ছেড়ে একমাত্র তাঁকে জান। কোথায় নক্ষত্রলোক, সেখানে যাওয়া যায় কিনা, এসব জেনে ভগবানলাভে কি সাহায্য হবে ? নানারকম অলৌকিক শক্তি-বিভূতি, বাস্তবিক বা কল্পিত, প্রকৃত কিংবা লোকঠকানো—যাই হ'ক, তার দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হচ্ছে ? এইটি বিচার করলে, মানুষ বুঝতে পারে, ধর্মের সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম হ'ল তাঁকে জানা, আস্বাদন করা। অলৌকিক শক্তি ভগবানের পথে বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। এ-শক্তি সাধকদের পক্ষে মহা অনিষ্টকর ; কথামৃতে বার বার এ-কথা ঠাকুর বলছেন। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন, যদি এসব বিভূতির একটিও কারো থাকে, জেনো সে আমাকে লাভ করতে পারবে না। এই বিভূতি ঐশ্বর্য, সাধকের উন্নতির পরিচায়ক, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের স্তর নির্ণায়ক নয়, বরং অবনতির চিহ্ন।

এ-সম্পর্কে ঠাকুরের অনেক গল্প আছে। এক ভক্তকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এতদিন সাধন ভজন ক'রে কিছু হয়েছে কি না! ভক্ত বললেন, 'ক'রে যাচ্ছি, তাঁর কৃপা হলে হবে।' 'ওসব বাজে কথা, কিছু পেয়েছ ?' ভক্তটি বললেন, 'না, তুমি পেয়েছ ?' 'হাঁ, পেয়েছি, দেখ'—বলে একটি হাতি যাচ্ছিল, তাকে বললেন, 'মর্'। হাতিটা অমনি মরে গেল। আবার বললেন, 'হাতি তুই বাঁচ্'—হাতিটি বেঁচে উঠল।

ভক্তটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন; তারপর বললেন, হাতিটা মরল আর বাঁচল; তোমার কি হ'ল? এ-প্রসঙ্গে বারো বছর সাধনার পর পায়ে হেঁটে নদী পার হবার অলৌকিক শক্তি অর্জনের গল্পটিও স্মরণীয়। ঠাকুর তাই বলছেন, এইটিই প্রশ্ন। কেউ নক্ষত্রলোকে, কেউ চন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোকে যায়, তাতে তোমার কি হ'ল? যে মানব-দেহদ্বারা ভগবান লাভ হয়, সে দেহ লাভ ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। এই সব শক্তি আধ্যাত্মিক পথ থেকে ভ্রষ্ট ক'রে মনকে অন্য দিকে চালিত করে।

এ-রকম ঐশ্বর্য দেখলে ঠাকুর ভক্তকে সাবধান ক'রে দিতেন; বেশী অনুগ্রহ করলে সে শক্তি নিজে হরণ করতেন, যাতে সাধন-পথে সে এগোতে পারে। ঠাকুরের কাছে চন্দ্র এবং গিরিজা আসতেন, তাঁদের অলৌকিক ঐশ্বর্যের কথা ঠাকুর বলেছেন। গিরিজা পিঠ দিয়ে আলোর জ্যোতি বার করতেন। ঠাকুর শম্ভু মল্লিকের বাড়ী থেকে ফেরার সময়ে অন্ধকারে পথ দেখতে না পাওয়ায় ঠাকুরকে দাঁড়াতে বলে পিঠের আলো দিয়ে পথ আলোকিত ক'রে দিলেন। ঠাকুর বেশ হেঁটে চ'লে গেলেন। বলেছেন, 'আমি দক্ষিণেশ্বরের ফটক পর্যন্ত বেশ দেখতে পেলাম, এত্ত আলো।'

কিন্তু তাতে তাঁর জীবনে কি লাভ হ'ল? ঐ শক্তিই তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল। তিনি তাঁর পার্ষদদের কাছে এ-সবের তীব্র নিন্দা ক'রে বলেছেন 'ওগুলো কেমন জানিস্, বেশ্যার বিষ্ঠার মতো। মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন।' বার বার বলেছেন, 'ঘৃণ্য বস্তু, ও থেকে সাবধান।'

এরপর মহাত্মারা আছেন কি না, এ-প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, "আমার কথা বিশ্বাস করেন তো, আছে। এসব কথা এখন থাক। আমার অসুখটা কমলে তুমি আসবে। যাতে তোমার শান্তি হয়,

যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হ'য়ে যাবে। আসল কথা, শান্তি চাও, না, ঐশ্বর্য চাও? ঐশ্বর্য চাইলে অন্যত্র যাও। ভাব এই—আমার অসুখ, নিজেকেই সারাতে পারছি না, তা তোমাকে কি দেব? শান্তি চাইলে এস, উপায় হ'য়ে যাবে। পথ ব'লে দিতে পারব। আবার বলছেন, "দেখছো তো, আমি টাকা লই না, কাপড় লই না। এখানে প্যালা দিতে হবে না, তাই অনেকে আসে!" ভরসা দিচ্ছেন, কিছু দিতে হবে না।

ডাক্তারের সঙ্গে হৃদ্যতা বেশী, তাই বলছেন, "তোমাকে এই বলা, রাগ কোরো না; ও সব তো অনেক করলে—টাকা, মান, লেকচার;—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আসবে, ঈশ্বরের কথা শুনলে উদ্দীপন হবে!"

এটি হচ্ছে, সার কথা। সাধুসঙ্গ, ভগবৎপ্রসঙ্গ—তা আবার শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে, যিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না। বাস্তবিক, আমরা সংসারে অবাস্তর বিষয় নিয়ে এমন মত্ত থাকি যে, ঈশ্বরের কথা ভাবার অবকাশ নেই। দৈবাৎ, যদি এমন লোকের সংস্পর্শে আসি, যিনি ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানেন না, তিনি যেন চুম্বকের মতো প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন; মনের ভিতর ঈশ্বরকে জানার ভাব থাকলে, তা শতগুণে বাড়িয়ে দেন। তাঁর প্রভাবে জীবন পরিবর্তিত হ'য়ে যায়।

দশ

কথামৃত—১।১৮।৬

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু ও অবতার ভাব

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় পূর্বসংস্কার ভুলতে পারছেন না। তাই তিনি ভাবছেন, অপরের সঙ্গে ব্যবহার কবার সময় মানবোচিত মর্যাদা রেখে ঠাকুরের ব্যবহার করা উচিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের ঘোরে লোকের গায়ে পা দেওয়া, ডাক্তারের চোখে বিসদৃশ লাগছে। ঠাকুর বলছেন, 'আমি তো জেনে কারো গায়ে পা দিই না। খেয়াল থাকে না। পরে এজন্য দুঃখ হয়।' তা শুনে ডাক্তার বলছেন, 'ইনি মেনেছেন দুঃখ হয়, কাজেই স্বীকার করা হ'ল—কাজটি অন্যায়।'

গিরিশ এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁকে বোঝাচ্ছেন যে, অন্যায় হয়েছে ব'লে দুঃখ করেননি। 'দুঃখ' এই জন্য যে, এ-রকম করার ফলে দেহে (যেটা যন্ত্র) নানা রকম উপসর্গ উপস্থিত হয়। তাই ব'লে, জীবের কল্যাণের জন্য, পা দিয়ে হ'ক, বা যেভাবেই হ'ক, জীবকে স্পর্শ করাতে তাঁর দুঃখ নয়। তিনি জগন্মাতার হাতের যন্ত্ররূপে কাজ করেন, নিজের কর্তৃত্ববোধ বা গুরুভাব নেই।

এটি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিশেষ ক'রে বোঝবার জিনিষ। তিনি অনেক সময় বলতেন, 'গুরু, কর্তা, বাবা—এ তিন কথায় আমার গায়ে যেন কাঁটা বেঁধে।' কখনো গুরুর পদ গ্রহণ করেননি। বলতেন, 'এক সচ্চিদানন্দই গুরু।' কিন্তু তাঁর মতো এত বড় গুরু আর কে আছে? তিনি সকলের অজ্ঞান, দুঃখ দূর করার জন্য, সকলকে

ভবসমুদ্র পার করাবার জন্য প্রাণপণ করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই কার্যে ব্যয় করেছেন, কোন কৃপণতা নেই। কিন্তু এত যে করা, তা নিজে করছেন—এ বুদ্ধিতে নয়। তিনি জগন্মাতার যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে কাজ করছেন। এটি অনুধাবন করবার বস্তু। তাঁর ভিতর একদিকে বিনয় ও অন্যদিকে গুরুভাব—এ দুটির এমন অপূর্ব সহাবস্থান যে, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হ'য়ে যায়।

লীলাপ্রসঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ তাঁকে সকলের কাছে যখন জগদ্গুরুরূপে উপস্থাপিত করছেন, তখন অনেকের মনে প্রতিক্রিয়া এসেছে, তিনি বিনয়ের অবতার, জগদ্গুরুর পর্যায়ে তাঁকে ফেলা যেন ভক্তদের গুরু-ভক্তির আতিশয্য! বাস্তবিক তাঁর অতি বিনীত ভাব যেমন সত্য, আবার কখন কখন ভক্তসমক্ষে আপনাকে জগদ্গুরুরূপে প্রকাশ করা তেমনই সত্য! এই দুই ভাব এক আধারে কি ভাবে সম্ভব, তা লীলাপ্রসঙ্গে বোঝানো আছে।

জগদ্গুরুরূপে বলছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হ'ক। তোমরা কি চাও?' কথাটির তাৎপর্য এই যে, তিনি এখানে ব্যক্তিরূপে নয়, ঈশ্বররূপে বলছেন, যেন যে যা চায়, তা দিতে তিনি প্রস্তুত। চণ্ডীতে আছে, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ বলছেন—"অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্ (দেবীসূক্ত)—আমি জগতের ঈশ্বরী, যে যা চায়, তাকে সে সম্পদ দিচ্ছি।" এ-কথা যখন বলছেন, তখন তিনি আর ঋষিকন্যা নন, জগদীশ্বরী স্বয়ং। ঋষি বামদেব সম্পর্কেও শাস্ত্রে এই প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। বামদেব বলছেন, "অহংমনুরভবং সূর্যশ্চ"—আমি মনু হয়েছি, আমি সূর্য হয়েছি। এই 'আমি'-টি কে? নিশ্চয়ই ঋষি বামদেব নন। কারণ বামদেবের জন্মের বহু পূর্বে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, মনুর আবির্ভাব হয়েছে। বামদেবের এ-কথা বলার তাৎপর্য এই যে, এই

এই আমি তাঁর শরীরে সীমিত নয়, সেই আমি তাঁর ঈশ্বরবুদ্ধিতে আমি, যিনি সর্বভূতে জীবরূপে আবিভূর্ত।

ঠাকুরও যখন দীনাতিদীনরূপে ব্যবহার করছেন, তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণরূপে রয়েছেন। আর যখন বলছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হ'ক। তোমাদের কি চাই?'—যেন যা চাই, তা দিতে তিনি সমর্থ—ঈশ্বরবুদ্ধিতে এ-কথা বলছেন। এ-দুটি ভাব যে একাধারে সম্ভব, লোকোত্তর পুরুষকে যাঁরা দর্শন করেছেন, মাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন। যেমন ভগবান গীতায় বলেছেন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। জীবকল্যাণের জন্য বহুবার তাঁর বহুরূপে আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ আবিভূর্ত রূপটি সীমিত। এ-রূপের উৎপত্তি আছে, অতএব নাশও আছে—নিত্যরূপ নয়। কিন্তু সেই অনিত্য রূপের পশ্চাতে একটি নিত্যস্বরূপ আছে। কখন তিনি সেই নিত্যস্বরূপে 'আমি' বুদ্ধি ক'রে কথা বলেন, কখন বা অনিত্যস্বরূপে।

অবতারতত্ত্ব

জীবকল্যাণের জন্য ভগবানকে বারে বারে আসতে হয়েছে। ঠাকুরও বলছেন, 'অবতারের মুক্তি নেই। অনেক বার আসতে হয়েছে এবং হবেও—শেষ নেই।' এই দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমার বহুবার জন্ম হয়েছে। এমন নয় যে, দশ অবতারে দশ বার জন্মেছি।' বলছেন, বহুবার। যখনই ধর্মের গ্লানি আসে, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি।

সঙ্গে সঙ্গে এটিও বুঝতে হবে, সাধারণ মানুষের মতো কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, নানাবিধ বাসনার দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে ভগবানের জন্ম হয় না। গীতায় অর্জুনকে ভগবান বলছেন, 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' (৪।৯)—যে আমার অলৌকিক জন্ম ও কর্মকে

জানে। এই অলৌকিক জন্ম-কর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, জীবের মতো মায়াবদ্ধ বাসনাপ্রেরিত হ'য়ে জন্ম নয়। তিনি জীবকল্যাণের জন্য মায়ার অধীশ্বর হ'য়ে, বাসনামুক্ত হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবকল্যাণকে যদি বাসনা ব'লে ধরা যায়, তিনি সেটি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, একটি অবলম্বনরূপে। তা না হ'লে স্থূলদেহ ধারণের কোন সার্থকতা থাকে না। কিন্তু এই স্থূলদেহ ধারণ পূর্ব-কর্মবশে নয়, কারণ সকল কর্মের ভিতরেও তিনি নিষ্ক্রিয়। অর্জুনকে ভগবান সেই কথাই বলছেন, 'আমি সব করছি, কিন্তু কিছুই আমি করছি না।' আমি সব করছি—লৌকিক দৃষ্টিতে ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু আমি কোন কর্মে লিপ্ত হচ্ছি না—কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে লিপ্ত হচ্ছি না। এই জন্য তাঁর জন্ম ও কর্ম দুইই অলৌকিক। সাধারণ মানুষ—আমরা তা বুঝতে পারি না। ভগবান তাই বলেছেন: সর্বভূতের অধীশ্বররূপ আমার পরম স্বরূপ না জেনে, মানবদেহ ধারণ ক'রে আছি ব'লে লোকে আমাকে অবজ্ঞা করে।

অবতার-তত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যটুকু না বুঝলে অবতারকে আমরা বুঝতে পারি না। শাস্ত্র অনেক চেষ্টা করেছেন, আমাদের এ-তত্ত্ব বোঝাবার জন্য, আমাদের জ্ঞানের অস্পষ্টতার জন্য আমরা তা বুঝতে পারি না। তাঁকে মনে করি, আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ। তাঁর ব্যবহার যখন আমাদেরই মতো—জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক ইত্যাদি জীবধর্ম তাতে প্রকাশিত—তখন কি ক'রে বুঝব, তিনি সর্বজীবের অধীশ্বর জগৎনিয়ন্তা!

প্রত্যেক অবতার সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য। অবতারের এ-দুটি ভাবই স্বাভাবিক—কল্পিত বা অভিনয়-মাত্র নয়। তিনি কখন ঈশ্বরভাবে, কখন জীবভাবে ব্যবহার করেন। দেহ-ঘরে এলেই দণ্ড ভোগ করতে হয়। পাঞ্চভৌতিক দেহের ফাঁদে প'ড়ে ব্রহ্মকেও কাঁদতে হয়। ব্যবহারে জীবভাব দেখা যায়। অবতার-পুরুষ দেহ ধারণ

করলে তার প্রতিটি ব্যবহার স্বীকার করেন। ভক্তির আতিশয্যবশে আমরা মনে করি—অবতারের মানবভাবগুলি সব কপটতা, ছলনা। অবতার কখনও মিথ্যাচার করেন না। সাধারণ মানুষ অবিদ্যা দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে কর্মের বন্ধনে বাধা হ'য়ে যা ভোগ করে, ভগবান স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেন জীবকল্যাণের জন্য। ঠাকুরের এ-ভাবটি সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন।

সীতার জন্য যখন রামচন্দ্র কাঁদছেন, সে কি কপটতা? অভিনয় মাত্র? যদি তা হ'ত, শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেত। তিনি পুরুষোত্তম হ'তে পারতেন না। তাঁর প্রতিটি ব্যবহারই সত্য। কখন মায়াগ্রস্ত হ'য়ে কাঁদছেন, কখনও রাজ-রাজেশ্বররূপে যে যা চাইছে, তাকে সেই বর দেবার জন্য প্রস্তুত। এ-দুটি ভাব মিশ্রিত থাকলে তাঁকে অবতার বলি।

এ-ভাব আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। এজন্য ঠাকুর বলতেন, নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। চোদ্দ পোয়া দেহের মধ্যে ভগবান বিরাজিত, এ ভাবা কঠিন। কল্পনায় ভগবানের যে মূর্তি ভেবেছি, তা লোকোত্তর। কিন্তু যে ভগবান, আমাদের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছেন তাঁকে কি ব'লে ভগবান ব'লে ভাবব? ঠাকুর বলছেন, এখানেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি যেখানে তিনি জীবরূপে লীলা করছেন। নররূপে লীলা দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হয়, তার ভূতমহেশ্বর রূপ কল্পনা করতে পারে না। সাধনার খুব উচ্চস্তরে গেলে এটি বোঝা সম্ভব হয়। তখন যিনি ভূতমহেশ্বর, সীমার অতীত—তিনিই সীমার মধ্যে লীলা করছেন। সীমার মাঝে অসীমের কল্পনা করা যে কত কঠিন, তা সাধকরাই জানেন। অসীম সমুদ্রের জল কি সীমিত পাত্রে ধরে? বিশ্ব-সংসার জুড়ে এবং বিশ্বের বাইরেও যিনি পরিব্যাপ্ত, তিনিই আবার চোদ্দ পোয়া দেহের মধ্যে সীমিত হ'য়ে আবির্ভূত হবেন, এটা কল্পনাতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাচ-খেলার দৃষ্টান্তটি অপরূপ। অবতার বাচ-খেলার মত সীমা ও অসীমের ভিতর ইচ্ছামত একবার একদিক, আবার ওদিক যেতে পারেন। রাজার ছেলের সাত দেউড়িতে অবাধ গতায়াতের মতো, সীমা ও অসীমের ভিতর যাঁর অবাধ গতি, তিনি ছাড়া আর কেউ এ-কথা ধারণা করতে পারবেন না। অবতারতত্ত্ব কল্পনার সময় এটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা উচিত।

ভগবান যেমন দুটি অবস্থায় দোলায়মান হ'য়ে স্বচ্ছন্দ বিহার করতে পারেন, সাধক যখন সেই অসীম ও সসীমের মধ্যে সমভাবে বিচরণ করতে সমর্থ হন, তখনই তিনি অবতারকে বুঝতে পারেন। সুতরাং মহেন্দ্রলাল সরকারের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের দেবভাব বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক। তাই তিনি ঠাকুরের মানবরূপের বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। তাঁর আশঙ্কা, দেবতার আসনে বসিয়ে এমন সুন্দর মানুষটির মাথা এরা খারাপ ক'রে দেবে। তাই বলছেন, 'ভগবান ভগবান ক'রে তোমরা এর মাথা খাচ্ছ।' তাঁর ভগবদ্‌তন্ময়তা, শিশুর মতো পবিত্র সরল স্বভাব দেখলে কে না মুগ্ধ হয়? মহেন্দ্রলাল সরকারও মুগ্ধ হয়েছেন। বলছেন, এমন অপূর্ব শিশুটি, একে দেবতার পর্যায়ে তুলে বিগড়ে দিও না। তাঁর বক্তব্যটির ভিতর আন্তরিকতা আছে সত্য; কিন্তু সীমার ভিতরের ঐশ্বর্যই তিনি দেখেছেন, তার বাইরের উপলব্ধি হয়নি ব'লে বুঝতে পারছেন না।

স্বামীজী ও গিরিশবাবুর মত

স্বামীজী এ-প্রসঙ্গে তাঁকে বুঝিয়ে বলছেন, 'ইনি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝখানে।' স্বামীজী এ-কথা বললেন—হয়তো তাঁর সংশয় সম্পূর্ণ যায় নি। সংশয় যে ছিল, তা বোঝা যায়। ঠাকুর শেষকালে বলেছেন, 'যে রাম, সে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। এ তোর বেদান্তের

দৃষ্টিতে নয়।' সেই সংশয় চরম মুহূর্তে দূর করার জন্য স্বামীজীর কাছে ঠাকুরের এই বাণী।

এখানে স্বামীজী বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর মাঝামাঝি অবস্থার মতো, মানব এবং দেবতার মধ্যবর্তী একটা অবস্থা আছে।

পরে স্বামীজী এ-ভাব অতিক্রম করেছেন। বলছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একমুঠো ধূলো থেকে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন। সে শক্তি মানুষের হয় না। আমাদের পক্ষে বিবেকানন্দের কল্পনা করাই কঠিন, আর যিনি ধুলো থেকে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ তৈরী করবেন, তাঁকে কে কল্পনা করবে? স্বামীজীর এই উক্তি অতিশয় গুরু-ভক্তির কথা নয়—তাঁর অনুভূতি থেকে এই ঐশী-শক্তির কথা বলছেন।

গিরিশবাবু ভক্তির সাহায্যে বুঝেছেন। তাই বলছেন, যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে ঈশ্বর ছাড়া আর কি ব'লব? বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারা লব্ধ অনুভূতিকে তিনি এ-ভাবে ব্যক্ত করেছেন। যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেননি। তিনি বলছেন, 'ঠাকুর স্বয়ং ঈশ্বর, আমাদের প্রতি করুণাবশতঃ সীমিতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের বন্ধন মুক্ত ক'রে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছেন, তাঁকে ঈশ্বর ব'লবনা তো কাকে ব'লব?' এই তাঁর ভাব। অসীম কি ভাবে সীমার মধ্যে প্রকাশিত হন, তা বোঝবার শক্তি আমাদের নেই। আর থাকলেও তা ভাষায় প্রয়োগ করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। এজন্য বলা হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া।

আচার্য শংকর ও অবতারতত্ত্ব

আচার্য শঙ্করের মতো ঘোর অদ্বৈতবাদী গীতাভাষ্যে বলেছেন, তিনি যেন জন্মেছেন, যেন দেহধারণ করেছেন—এই ভাবে লোকের প্রতি

অনুগ্রহ ক'রে তিনি অবস্থান করেন। লোকের প্রতি অনুগ্রহ করছেন, আমরা, সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধি করছি। ভাগবতে আছে, 'অজ জন্ম গ্রহণ করলেন।' অজ অর্থাৎ যাঁর জন্ম নেই, তিনি জন্ম গ্রহণ করলেন। কি উপায়ে তাঁকে আস্বাদন করা যায়, তা দেখিয়ে দেবার জন্য, অনুগ্রহ ক'রে তিনি জন্ম গ্রহণ করলেন।

এই লোকানুগ্রহ আমরা আস্বাদ করতে পারি, কিন্তু কেমন ক'রে জন্মালেন, তা আমাদের বুদ্ধির অতীত। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।' তর্ক বা যুক্তির অতীত বস্তুকে তর্কের দ্বারা সংযোজিত অর্থাৎ তর্কের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করবে না। শাস্ত্র এ-কথা বলছেন। অতএব তর্ক—তার প্রয়োগের ক্ষেত্র নেই ব'লে প্রতিহত হ'য়ে যাবে। বাক্যমনের অতীত বস্তুকে মন বুদ্ধির গোচর করতে চাইলেও আমরা তা পারব না। 'ন তত্র চক্ষু র্গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনঃ'—চক্ষু বাক্ মন সেখানে যায় না। কিন্তু বুঝতে না পারলেও শ্রদ্ধা-ভক্তির সাহায্যে দৃষ্টান্ত দেখে ধারণা করতে পারি এটা অসম্ভব নয়। গিরিশের মতো অগাধ বিশ্বাস থাকলে বিশ্বাসের প্রাবল্যে তত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায়। বিশ্বাস মানুষকে যখন নিঃসংশয় ক'রে দেয়, তাকে বলা হয় 'জানা'। জ্ঞান মানে—যেখানে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বস্তুর উপলব্ধি, বিশ্বাসের ভিতর দিয়েও হ'তে পারে। ঠাকুর তাই গিরিশের বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উপনিষদ্ বলছেন—শ্রদ্ধাবান্ হ'ও। গীতায় ভগবান বলছেন, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—যে শ্রদ্ধাবান্, সেই জ্ঞান লাভ করে।

অবতার পূজা

স্বামীজী বলছেন, 'আমরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানবরূপে পূজা করি, যে মানবের পূজা ঈশ্বর-পূজার অনুরূপ। কথাটির তাৎপর্য এই, আমরা

কি ভাবে ঈশ্বরকে পূজা করি? আমাদের লৌকিক জ্ঞানে যে মানবীয় গুণগুলি থাকলে কাকেও পূজ্য বলে গণ্য করি, সেগুলিকে অনন্ত পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে সেই গুণগুলির দ্বারা ভূষিত ব্যক্তিকে ঈশ্বররূপে ধারণা করি। আমাদের অনুভূত গুণগুলি অনন্ত পরিমাণে বাড়ালে হয়তো তাঁর সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হয়—এছাড়া অন্য পথ নেই। স্বামীজী বলছেন, আমরা তাঁকে মানুষ বলে পূজা করি, কিন্তু সে মানবত্ব ঈশ্বরের সমীপবর্তী, অর্থাৎ তাঁর দ্বারাই ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারি। অন্য উপায়ে নয়। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এটি। মানবের চরমোৎকর্ষ, মানবীয় গুণগুলি যখন সীমাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তাঁকে বলি 'ঈশ্বর'। সে ঈশ্বর মানুষের কাছাকাছি নয়, মানবত্বের চরম পরাকাষ্ঠা।

স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, যদি একটি গরু ঈশ্বরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, সে তাঁকে একটা প্রকাণ্ড গরু রূপেই চিন্তা করবে। এর থেকে অধিক কিছু চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ধারণা করবে কি ক'রে? 'দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ'—দেবতা হ'য়ে দেবতার উপাসনা করতে হয়। মানে কি? দেবত্ব চিন্তা করতে করতে আমার নিজের ভিতরটি বিকশিত হয়। যত বিকাশ হয়, তত আমাদের ভিতরের আদর্শ যেন আমাদের কাছে ফুটে উঠে। যখন এমনি ক'রে আমার বিকাশ আদর্শের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, তখনই শেষ কথা।

শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন, উপাসক যখন উপাস্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখনই উপাসনার পরাকাষ্ঠা, মানুষ তখন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়। ঈশ্বরের উপাসনা করতে করতে ঈশ্বর হয়। মানবতার আবরণ অপসৃত হ'লে সে যা ছিল, তাই হ'ল অর্থাৎ ঈশ্বর হ'য়ে গেল।

জীব তখন শিব হ'য়ে গেল, তার স্বরূপকে প্রাপ্ত হ'ল।

পরিশিষ্ট, ১ম পরিচ্ছেদ

বরানগর মঠ, স্বামীজী ও রবীন্দ্র

কথামৃতের প্রথম ভাগের শেষাংশে মাস্টারমশাই বরানগর মঠের যে চিত্রটি উপস্থাপিত করলেন, সেটি ঠাকুরের যে লীলাকথা এতদিন ধ'রে তিনি প্রকাশ করেছেন, তারই অনুষঙ্গ। ঠাকুরের সন্তানরা কিভাবে ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হ'য়ে জীবনের পরবর্তীকাল কাটাবেন, তারই প্রস্তুতিপর্ব-রূপে বরানগর মঠের চিত্রটি বর্ণনা করেছেন। ঠাকুর স্থূলদেহে নেই, কিন্তু তাঁর ভাব প্রত্যেকের ভিতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত রয়েছে, আগের মতোই সর্বদা তীব্র বৈরাগ্যের কথা, ধ্যানধারণা আর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ চলছে।

ঠাকুরের দেহাবসানের প্রায় এক বছর পর বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর সন্তানেরা—বিশেষ ক'রে যাঁরা ত্যাগের জীবন যাপন করবেন, প্রথমে তাঁরা বিচ্ছিন্ন, দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিলেন। নরেন্দ্র আবার তাঁদের একত্র ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে এই সংঘের প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী হ'য়ে বরানগর মঠ স্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, যিনি কাশীপুর বাগানবাড়ীর ভাড়া দিতেন, তিনি একদিন বললেন, 'দেখ তোমরা একটা জায়গা কর, যেখানে সকলে মিলিত হ'য়ে ঠাকুরের প্রসঙ্গ হবে, আর আমাদের মতো গৃহস্থ ভক্তদের একটা জুড়োবার জায়গা হবে। আমি যেমন বাড়ীভাড়া দিতাম, দেব।' তদনুসারে বরানগর মঠের প্রতিষ্ঠা। তখন বরানগর এত জনবহুল ছিল না। এক জায়গায় জঙ্গলে ঘেরা একটা জীর্ণ পরিত্যক্ত

দোতলা বাড়ী ছিল, ভূতের ভয়ে দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ যেত না, সাপের ভয়ও ছিল, তাই মাত্র দশ টাকা ভাড়াতে বাড়ীটি পাওয়া গিয়েছিল। স্থানটি ছেলেদের খুব পছন্দ হয়েছিল—কলকাতার কাছেই ভক্তদের পক্ষে সহজগম্য অথচ নির্জন। সংসারতাপে তাপিত ভক্তেরা শান্তির আশ্রয় পাবে। তাই ঐ বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। মাস্টারমশাই সেখানকারই একটি দিনের (৯ই মে, ১৮৮৭) চিত্র তুলে ধরেছেন।

প্রকৃত নাম গোপন রেখে রবীন্দ্র-নামে একটি ভক্তের কথা এখানে বলা হয়েছে। সংসারের মোহে প'ড়ে, নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অল্প বয়সেই রবীন্দ্র খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এখন ঠাকুরের কথা মনে পড়েছে। আগে ঠাকুরের কাছে এলেও খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেননি। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "তোর কিন্তু দেরী হবে, এখন তোর একটু ভোগ আছে।" কেন বললেন, আমরা জানি না। তবে মনে রাখতে হবে—তিনি বলেছেন যে, যখন তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকে তখন চেষ্টা করেও ভগবানের দিকে মন দেওয়া যায় না। ভোগ কিছুটা হ'য়ে গেলে মনের শান্ত অবস্থা যখন আসে, তখন কতকটা মন ভগবানে দেওয়া যেতে পারে। এ-রকম ভাবের কেউ এলে ঠাকুর তাঁর ভাষায় বলতেন, 'খেয়ে লে, পরে লে'—অর্থাৎ প্রথমেই তিনি বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন না। জানতেন, প্রথমেই বৈরাগ্যের উপদেশ তার মনে রেখাপাত করবে না, নিষ্ফল হবে। কাজেই এ-রকম ক্ষেত্রে তিনি ভোগ ক'রে নিতে বলতেন ; তারপর সময় এলে মোড় ফিরিয়ে মনকে ভগবানের দিকে দিতে বলতেন। তাই রবীন্দ্রকে বলেছিলেন, 'এখন না, পরে হবে।' পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপদেশ হিতকর।

বলা বাহুল্য ঠাকুর কেবল বর্তমান দেখছেন না, অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখে কথা বলছেন। আমরা বিচার করি বর্তমান দেখে, কিন্তু যাঁরা

ত্রিকালদর্শী, বর্তমান তাঁদের কাছে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় মাত্র। মাঝের একটি পাতা পড়লেই যেমন বই পড়া হয় না, আগে পরে কি আছে জানতে হয়, তেমনি যাঁদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী, তাঁরা আগে পরে দেখেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও এমনি নির্দেশ দিয়েছেন। বেদে কর্মকাণ্ডের ভিতর ক্রমাগত নানা প্রকার যাগযজ্ঞের নির্দেশ আছে। বেদ শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশাস্ত্র, সেখানে কেন এত সকাম যাগযজ্ঞের কথা উল্লেখ করা হ'ল, এ-প্রশ্ন অনেক সময় মনে ওঠে। ত্যাগ-বৈরাগ্যের, ভগবদ্-অনুভূতি লাভের পথনির্দেশের পরিবর্তে কি করলে আমাদের ধন-সম্পদ-আয়ু বৃদ্ধি হবে, সান্তানাদি লাভ হবে, তার কথা আছে। এমনকি, কি ক'রে শত্রুনিধন হবে, সে বিদ্যাও বেদে আছে। কেন এগুলি বেদে স্থান পেল, তার উত্তর হচ্ছে—মানুষের মনে এই ভাবগুলি রয়েছে। ভোগ-বাসনা যখন মনে প্রবল, তখন তাকে ভগবানের দিকে ফেরাতে হ'লে তার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ কিছু উপদেশ দিতে হবে। সেইজন্য উপদেশের আগে দেখতে হয়, অধিকারী কেমন, উপদেশও তদনুসারে। তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা কিভাবে মেটাতে পারা যায়, তার উপায় শাস্ত্র ব'লে দিয়েছেন। ভোগাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন মনকে ভগবানের দিকে নিয়ে যেতে হ'লে ধীরে ধীরে কিছু ভোগের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এইজন্য ভোগের ব্যবস্থা। তন্ত্রে এর পরাকাষ্ঠা। ভোগের ভাগে প্রচুর উপকরণের কথা তন্ত্রে বলা আছে। শাস্ত্রের উপদশ :

> ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
> প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

মানুষের এগুলি স্বভাব। স্বভাবের বিরুদ্ধে কেউ চলতে পারে না, কিন্তু নিবৃত্তি মহাফলদায়ক। সে পথে যেতে হ'লে ধীরে ধীরে এর মোড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে নিয়ে যেতে হবে। এটি ঠাকুরের উপদেশ এবং শাস্ত্রেরও কথা।

আঘাত পেয়ে রবীন্দ্রের মনে বৈরাগ্যের ভাব এসেছে। এখানে উল্লেখ আছে, ঠাকুরের কাছে তিনি একবার তিন রাত্রি ছিলেন। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ঠাকুরকে বিস্মৃত ক'রে দিয়েছিল। পরে সেখানে ঘা লেগেছে, ঠাকুরের কথা মনে পড়েছে। তিনি তীব্র বৈরাগ্যের ভাব নিয়ে মঠে এসেছেন নিজেকে পরিবর্তিত করার জন্য। কি রকম বৈরাগ্য সে চিত্রটি এখানে রয়েছে। রবীন্দ্র মঠে উপস্থিত হ'লে, নরেন্দ্র প্রমুখ সংসারত্যাগী সন্তানরা তাঁকে ঘৃণ্য ব'লে পরিত্যাগ করলেন না, সাদরে গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, যাতে তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক ভাব স্ফুরিত হয়, বৈরাগ্য দৃঢ়ভিত্তিক হয়—এই ছিল তাঁদের আকাঙ্ক্ষা। নরেন্দ্রনাথের বিশাল হৃদয় সকলের প্রতি সমান সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁর উদারতার সূচনা এইখানে। পরে দেখা গিয়েছে, তিনি ঘৃণিত বারাঙ্গনাদের জন্যও কাতর হ'য়ে প্রার্থনা কবছেন।

একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসবে কেউ কেউ অভিযোগ করলেন—কিছু বারবণিতা এসে উৎসবের মাহাত্ম্য খর্ব করছে, এদের প্রবেশাধিকার না থাকাই উচিত। নরেন্দ্রনাথ শুনে ক্ষোভে বলেন, ঠাকুর কি কতকগুলি জ্ঞানী, গুণী, শুদ্ধ পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য এসেছিলেন? তিনি সকলের জন্য এসেছিলেন। বিশেষ ক'রে যারা পতিত, ঘৃণিত, কোথাও যাদের স্থান নেই, তাদের জন্য তাঁর দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে। আমরা চাই—তারা সকলে এখানে আসুক, এসে নবজীবন লাভ করুক। স্বামীজীর হৃদয়ের এই অভিব্যক্তি এখানে রবীন্দ্রকে দেখে প্রকাশ পেয়েছে।

মাস্টার মশায়ের কোমল হৃদয় রবীন্দ্রের আর্তভাব দেখে বিগলিত হয়েছিল। তিনি নিজে তাঁকে সঙ্গে ক'রে গঙ্গাস্নানে নিয়ে গেলেন, শ্মশানে মৃতদেহ দেখালেন, বৈরাগ্যের উদ্দীপন হয়, এমন সব কথা বললেন। রবীন্দ্র এখানে এসেছেন বটে, কিন্তু মন চঞ্চল—ধ্যানে বসতে পারছেন না।

বরানগর মঠের ছবিটি বেশ বোঝা যায়। নরেন্দ্র গান করছেন—'পীলে রে অবধুত হো মত্‌বারা'—মাস্টারমশাইয়ের মনে হচ্ছে রবীন্দ্রকে হিতবচন বলছেন। গানটির শেষাংশে আছে—নাভিকমলে কস্তুরী আছে, সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত, কিন্তু হরিণ জানে না—কোথা থেকে এই গন্ধ আসছে। সে মাতাল হ'য়ে চতুর্দিকে গন্ধের উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছে, জানে না উৎস তারই ভিতর। তেমনি মানুষ আনন্দের জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, ভোগের বস্তুর পিছনে ছুটে ছুটে জীবনটা শেষ করছে। জানে না আনন্দের উৎস তার অন্তরে, আত্মা থেকে সকল আনন্দ প্রকাশিত, বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মানুষ যখন সন্ধান পাবে অন্তরে আকৃষ্ট হবে, অন্তর্মুখ হবে। মৃগ যেমন ঘাসের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছে, মানুষও তেমনি সদ্‌গুরুর অভাবে ভোগের মধ্যে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সদ্‌গুরু জানিয়ে দেন, আনন্দ কোথা থেকে আসছে এবং পাবার উপায় কি। তিনি মনের মোড় ফিরিয়ে দেন।

সদ্‌গুরুর কি অভাব হয়েছে যে, মানুষ ভোগের মধ্যে আনন্দ খুঁজছে? তা নয়। আমাদের মনে যে ভোগতৃষ্ণা রয়েছে, তার কিছুটা তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত হাজার বার বললেও শাস্ত্র অথবা সিদ্ধপুরুষ কারো উপদেশ আমাদের কাজে লাগে না। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কামকাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ বছরের পর বছর দিয়েছেন, নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন, কিন্তু ক-জনের জীবনে তা সফল হয়েছে? ক-জন তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ত্যাগের জীবন বরণ করতে পেরেছে? অধিকাংশই পারেনি। কারণ যতক্ষণ না মন বিষয়বিতৃষ্ণ হচ্ছে, একটু বৈরাগ্যের ভাব মনে আসছে, ততক্ষণ বৈরাগ্যের কথা তার কানে প্রবেশ করে না, কিংবা প্রবেশ করলেও মর্মকে স্পর্শ করে না। প্রচলিত একটি কথা আছে—লালাবাবু ধোবানীর মুখে 'বেলা গেল, বাসনায় আগুন দিতে হবে' কথাটি শুনে ভাবলেন, জীবনের দিন চলে গেল,

বাসনায় আগুন দেওয়া হ'ল না। বৈরাগ্যভাবের এই কথাটি যেই মনে এল অমনি চলে গেলেন।

একটি কথায় কি বৈরাগ্য হয়? কতবার অনুরূপ কথা হয়তো লালাবাবু শুনেছিলেন, কিন্তু মনে এই রেখাপাত করেনি। এই রকম বৈরাগ্যের কথা অহরহ শুনলেও আমাদের জীবনে তা সফল হয় না, কার্যকর হয় না। কেন হয় না? কারণ আমাদের মন ভোগাসক্ত। জীবনে বিতৃষ্ণা এলেই বৈরাগ হয় না, বৈরাগ্যের প্রকৃত উৎস আর একটি রসের সন্ধান। ঠাকুর বলতেন, 'ওলা মিছরীর পানা খেলে আর চিটে গুড়ের দিকে মন যায় না।' 'হরি প্রেমরসের' সন্ধান যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ সংসারের আনন্দ আমাদের আকর্ষণ করে। সমস্ত বিষয়ানন্দ ভগবদ্-আনন্দের একটি ক্ষুদ্র অংশ। ঠাকুর বলতেন, চুম্বক লোহাকে টানে। কিন্তু যদি ছোট চুম্বক একদিকে এবং বড় চুম্বক আর একদিকে টানে, তা হ'লে লোহা কোনদিকে যাবে? অবশ্যই বড় চুম্বক তাকে আকর্ষণ করবে। ভগবান বড় চুম্বক, তাঁর আকর্ষণ হ'লে অন্য আকর্ষণ শিথিল হ'য়ে যায়। সমগ্র জীবনব্যাপী ভোগের পরও মানুষ ভাবে জীবনটাকে আরো একটু যদি বাড়ানো যায়, তা হ'লে বেশ হ'ত।

পুরাণে যযাতির উপাখ্যানে এই কথাই বলা হয়েছে। দীর্ঘ জীবন ভোগ করেও যযাতি তৃপ্ত হননি। পুত্র পুরুর যৌবন নিয়ে আরও ভোগ ক'রে শেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন:

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ ভাগবত ৯.১৯.১৪

মানুষের কামনা কাম্যবস্তুকে উপভোগ ক'রে শান্ত হয় না। ঘি দিলে যেমন আগুন শান্ত না হ'য়ে জ্বলে ওঠে, সেই রকম কামনাপরায়ণ মনে ভোগ অর্পণ করলে, সেই কামনা শতগুণে জ্বলে ওঠে। ভোগ

মনকে শান্ত করতে পারে না—এ শাস্ত্রের বিধান, মানুষেরও এই অভিজ্ঞতা

এর পর বর্ণনা আছে—নরেন্দ্রনাথ নিজে চৈতন্যদেবের প্রেম বিতরণের কথা পড়ছেন। একজন ভক্ত বলছেন, "কেউ কারুকে প্রেম দিতে পারে না।" অন্তর থেকে যা অনুভূত, যা অন্তরে প্রেরণা দেয়, তাকে বলে প্রেম। সেই প্রেম অপরে দেবে কেমন ক'রে? নরেন্দ্রনাথ বলছেন, "আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।" যেমন জিনিস হাতে ক'রে দেওয়া যায়, যাঁরা প্রেমস্বরূপ, তাঁরা ঠিক তেমনি ক'রে তাঁদের প্রেম অপরকে দিতে পারেন। অবশ্য যোগ্য আধার না হ'লে সেই প্রেম গ্রহণ করতে, ধারণা করতে পারে না। প্রেম যে প্রত্যক্ষ, স্পর্শ করা যায়, মুঠো ক'রে ধরা যায়, অপরকে দেওয়া যায়, এ বৈশিষ্ট্য সাধারণের হ'তে পারে না। অসাধারণ লোকোত্তর পুরুষ, বিশেষ ক'রে, ভগবান অবতীর্ণ হ'য়ে যখন আসেন, তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। ইচ্ছামাত্র তিনি কারো হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করতে পারেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে প্রেম বিতরণ অসম্ভব কথা নয়, সত্যই তিনি তা পারতেন। ধনী যেমন তার ধন বিতরণ করতে পারে, প্রেমস্বরূপ যিনি, তিনিও প্রেম বিতরণ করতে পারেন এবং করেছেন। নরেন্দ্রনাথ নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমার ঠাকুর প্রেম দিয়েছেন।

রবীন্দ্র স্নান ক'রে এলে তাঁকে একখানি গেরুয়া কাপড় দেওয়া হ'ল। তাঁদের হয়তো অন্য পরিধেয় ছিলই না, দু-একখানা কাপড়ই থাকত। মঠের বাইরে গেলে সাদা কাপড়, আর ভিতরে গেরুয়া পরতেন। নরেন্দ্র মণিকে বলছেন, "এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে।" গেরুয়াকে বৈরাগ্যসূচক ত্যাগীর বস্ত্র বলা হয়। মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে যে কাপড়ের রং মলিন হ'য়ে যায় তাকে শাস্ত্রে বলেছে, বিবর্ণ বাস অর্থাৎ যার স্বাভাবিক রং নেই। সন্ন্যাসী হবে সেই বিবর্ণ বস্ত্রধারী।

পরে সাধারণে যে রং ব্যবহার করে না, তাতে ডুবিয়ে ত্যাগীর বস্ত্র রং করা হ'ত, কাষায় বস্ত্র। কাষায় মানে কোন রং যা দিয়ে কাপড় রাঙানো যায়, সে রং সাধারণের ব্যবহার্য নয়। গিরিমাটি দিয়ে তৈরী হয় বৈরাগ্যের রং গেরুয়া। গিরি অর্থাৎ পাহাড়, একরকম পাহাড়ী মাটি যা ঘষে ঘষে কাপড় রং করা হয়।

নরেন্দ্রের হৃদয় এমন যে রবীন্দ্রের বৈরাগ্য দেখে তাকে ত্যাগের বস্ত্র দিচ্ছেন, অধিকারী বিচারের কথা এখানে নয়। কয়েকদিন এখানে থাকার পর তিনি চ'লে যান। হয়তো তাঁর ভাগ্যে সন্ন্যাস ঘটেনি; কিন্তু এই ছবিটিতে বোঝা যায়, সংসারের আঘাতে বৈরাগ্যের ভাব নিয়ে এসেছেন ঠাকুরের নামাঙ্কিত এই স্থানে। ঠাকুরের উপদেশ শোনা ছিল, জীবনে কার্যকর হয়নি। মনের এই আলোড়িত অবস্থায় মনে পড়েছে ঠাকুরের কথা। তাঁর চরিত্র যতই অশুদ্ধ হ'ক, ঠাকুরের পূত সংস্পর্শজনিত স্মৃতি তাঁর জীবনে কাজ ক'রে চলেছে। জীবনের এই মোড় ফেরা দেখে নরেন্দ্রনাথের এত করুণা, এত সহানুভূতি। ত্যাগীর বসন পরালেন—ভাবটি তাঁর জীবনে যেন স্থায়ী হয়।

বার

পরিশিষ্ট, ২য় পরিচ্ছেদ

অবতারসঙ্গ ও অশ্বিনীকুমার

পরিশিষ্টের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাস্টারমশাই অশ্বিনীকুমার দত্তের লেখা একটি পত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন। অশ্বিনীবাবু অল্পদিন মাত্র ঠাকুরের দেখা পেয়েছেন, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেননি। তিনি চিন্তাশীল এবং সুলেখক ছিলেন ; পত্রটিতে মনোজ্ঞ ভাষায় ঠাকুরের স্মৃতিচারণের যে চিত্রটি তিনি দিয়েছেন, তা অপূর্ব। তিনি যে দিকটি দেখেছেন, নিপুণ লেখনীতে কেমন ক'রে সেটি ফুটিয়ে তুলেছেন—তা লক্ষণীয়।

ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা দীর্ঘদিন থেকেছেন, সর্বদা ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছেন, তাঁরাই যে তাঁকে বেশী ক'রে বুঝেছেন, তা নয়। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের একটি উক্তি স্মরণীয়। জনৈক ভক্ত তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'এখানে এসেছি সাধুসঙ্গ করতে।' তদুত্তরে স্বামী সারদানন্দ বললেন, 'দেখ, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাঁরা সর্বদা আসতেন, বা কালীবাড়ীর কর্মচারীরা কিংবা পাড়াপ্রতিবেশী যাঁরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন, তাঁদের জীবনে যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে, এমন দেখা যায় নি। আর যাঁরা তাঁর জীবনের শেষ চার বছর কি অতি অল্প দিনের জন্য ঠাকুরের কাছে এসেছেন—এঁদের মধ্যে কেউ হয়তো সপ্তাহে একদিন এসেছেন, বড়জোর কেউ দু-চার মাস ঠাকুরের কাছে থেকেছেন, তাও একাদিক্রমে নয়—তাঁদের জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। কিন্তু যারা বছরের পর বছর ঠাকুরের সঙ্গে একসঙ্গে কাটাল, তাদের জীবনে কোন

পরিবর্তন হ'ল না।' কাজেই সাধুসঙ্গ মানে কতদিন ধ'রে ঘনিষ্ঠভাবে সাধুদের সঙ্গে কেউ থাকল, তার দ্বারা ফল নির্ণীত হয় না। এটা সুস্পষ্ট যে, আধার প্রস্তুত না হ'লে সে পাত্রে কোন বস্তু ধ'রে রাখা যায় না। ঠাকুরের কাছে এসে যাঁরা জীবন ধন্য করেছেন, তাঁদের আধার তৈরী ছিল। মনে হয়, সেজন্য তাঁর কৃপা তারা ধারণা করতে পেরেছেন। যাঁদের সে প্রস্তুতি ছিল না তাঁরা ঠাকুরের কাছ থেকে কিছুই নিতে পারেননি, অন্ততঃ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে তাই মনে হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গের অর্থ দৈনিক নৈকট্য নয়। শাস্ত্রের নির্দেশ—যে অধিকারী তারই কেবল ফলপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি হয়। যাকে তাকে উপদেশ দিলে সার্থকতা তো থাকেই না, কখন কখন বিপরীত ফল হয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বেদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ। বৃহস্পতি আত্মার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির কথা বলেছেন—বিভ্রান্ত করার জন্য নয়, ক্রমশঃ মনকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বে নিয়ে যাবার জন্য। ধাপে ধাপে উত্তর দিচ্ছেন যাতে ক্রমশঃ সমস্ত উপাধি-নির্মুক্ত আত্মতত্ত্বে পৌঁছানো যায়।

শাস্ত্রে একে অরুন্ধতী-ন্যায় বলে। যে অরুন্ধতী নক্ষত্র চেনে না, তাকে চেনাতে গিয়ে প্রথমে সপ্তর্ষিমণ্ডলে দৃষ্টি দিতে বলা হয়। তারপরে নীচের দিকে তৃতীয় তারাটিতে যার নাম বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের দিকে ভাল ক'রে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বশিষ্ঠের পাশে অতি অস্পষ্ট একটি নক্ষত্র আছে, সেইটি অরুন্ধতী। প্রথমেই অরুন্ধতীকে দেখাতে গেলে দেখা যেত না। শাস্ত্রও সেইভাবে আত্মজ্ঞান দেবার সময় স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, তারপর আরো সূক্ষ্মে নিয়ে যান।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ বস্তুর সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই এবং পরিচয় করা খুব কঠিন। সব জিনিসকে যিনি অনুভব করেন তাঁকে অনুভব ক'রব কি ক'রে? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'

(বৃ. উ. ২.৪.১৪)—বিজ্ঞাতাকে কোন্ উপায় দ্বারা জানব ? তিনি নিত্য জ্ঞাতা, কখন জ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হন না। জ্ঞানের সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুকে আমরা জানি। বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞানেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৈতন্যকে পাই। এই সংশ্লিষ্ট অংশকে বাদ দিলে রইল শুদ্ধ চৈতন্য, সেইটি আত্মা। এই শুদ্ধ চৈতন্য আমাদের ধারণার অতীত। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ বোঝাতে বলছেন, এর পর আর সংজ্ঞা থাকে না, অর্থাৎ বৃত্তি জ্ঞান থাকে না। এই স্বরূপটি বোঝা বড় কঠিন। সমস্ত উপাধি নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে যা রইল, তাই আত্মা। তাঁকে আর বর্ণনা করা যায় না। ভগবানকে যেমন বোঝা সহজ নয়, তেমনি তিনি যখন দেহ ধারণ ক'রে আসেন, তাঁকে বোঝাও সহজ নয়। সুতরাং যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসে তারা যে সকলেই তাঁকে বুঝবে, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। ঠাকুর বলছেন, রামচন্দ্রকে মাত্র চব্বিশ জন ঋষি ঈশ্বরাবতার ব'লে জেনেছিলেন, আর সকলে দশরথের ব্যাটা ব'লে জানত। জানার উপায় কি ? উপায় মনের শুদ্ধি। ঠাকুরের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, সকলেই কি শুদ্ধ মন নিয়ে এসেছিলেন ? আসেন নি ব'লে তাঁকে বুঝতে পারেন নি। কাজেই ঠাকুরের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন ব'লে মনে করি, তাঁদের সকলেই তাঁর সঙ্গ লাভ করতে পারেননি। নৈকট্য মানেই সঙ্গ হওয়া নয়। উপমা দিয়ে বলা যায় বেতারের সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ চারিদিকে প্রবাহিত, কিন্তু আমাদের কানে আসছে না। কেবল সুরে বাঁধা ('tune' করা) গ্রাহক যন্ত্র (receiver)-এ ধরা পড়ে। মনকেও ঐ-ভাবে সুরে বাঁধতে পারলে আমাদের কানে সেই সুর ধরা পড়বে, অন্য কোন উপায়ে নয়। মনে সদ্ভাব না থাকলে সাধুসঙ্গ হয় না। এজন্য অবতারের কাছে এলেও অবতারকে চেনা যায় না। ভাগবতে আছে, জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, মাছেরা প্রতিবিম্বিত চাঁদকে তাদেরই মতো জলচর প্রাণী মনে

ক'রে খেলা করছে, আকাশের চাঁদ ব'লে তারা জানে না। অবতারও যখন আমাদের কাছে আসেন, আমাদের দৃষ্টি তাঁকে মানুষরূপে দেখে।

তা হ'লে যারা তাঁকে ভালবাসে আর যারা দ্বেষ করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে। যারা দ্বেষ করে তারা নিজেরাই তাঁর থেকে দূরে স'রে রইল। আর যাঁরা তাঁকে আপনার করেছে, বস্তুধর্মের প্রভাবে তাদের মনের শুদ্ধি হয়। তাঁকে না জানলেও, তাঁর স্বরূপকে না বুঝলেও কল্যাণ হয়। ভাগবতে আছে, গোপীরা ভগবানকে পরমেশ্বররূপে বুঝতে পারেননি, কান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। ভগবৎ-তত্ত্বকে স্বরূপতঃ না হলেও কান্তভাবে ভালবেসেছেন, তাই তাঁদের মুক্তি হ'ল। এতে তাঁদের কৃতিত্ব নেই, এ ভগবানের স্বরূপ—বস্তুধর্ম, তাই তাঁদের কল্যাণ হ'ল।

তা হ'লে কি যাঁরা ঠাকুরের সান্নিধ্যে রইলেন তাঁদেরও এ-রকম কল্যাণ হবে? হবে। তাঁর স্বরূপ জেনে অথবা না জেনে যাঁরাই তাঁকে ভালবাসেন, আপনার ব'লে গ্রহণ করবেন, বস্তুধর্মের প্রভাবে তাঁদের কল্যাণ হবেই। পুরাণ এ-বিষয়ে আরো এগিয়ে বলেছে, তাঁর উপর দ্বেষ করলেও কল্যাণ হবে। শিশুপালাদি তাঁর উপর দ্বেষ ক'রত, শত্রুতার জন্য সর্বদা মনে এক চিন্তা, সর্বত্র তাঁকে দেখছে, এর থেকে তাদের কল্যাণ হ'ল। এটি অতিশয়োক্তি মনে হ'তে পারে, বিশেষ ক'রে বস্তুমাহাত্ম্যের জন্য এ-রকম বলা হয়েছে। তা না হ'লে আমরা ইঁট কাঠ খড় গরু বস্তু ব্যক্তি যা দেখছি, সবই কি ব্রহ্ম নয়? শাস্ত্র বলছেন, সবই ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মদৃষ্টি তো আমাদের হচ্ছেই, তা হ'লে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ যে ফল, তা লাভ হবে। তা হচ্ছে না কেন? কারণ ব্রহ্মরূপে দেখছি না, জগদ্রূপে মায়াযুক্তরূপেই দেখছি এ-সব, স্বরূপে দেখছি না। শাস্ত্র বলছেন, স্বরূপের অনুভূতি হ'লে কল্যাণ হবে। ভক্তিশাস্ত্র অত বিচারে যান না। তাঁরা বলেন যে, যেমন করেই

হ'ক, তাঁতে মন স্থির হ'লে, দৃঢ় হ'লে বস্তুধর্ম অনুসারে মন শুদ্ধ পবিত্র হ'য়ে যায়। সে দৃষ্টি আত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে অশ্বিনীকুমার দত্ত মাত্র চার-পাঁচ দিন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন, কিন্তু মনে এমন রেখাপাত হয়েছে যে তার স্মৃতি জন্ম-জন্মান্তরের সম্বল হ'য়ে থাকবে। তাঁর মনটিকে এমনভাবে তৈরী ক'রে এনেছিলেন যে তাতে সেই দেবচরিত্রের প্রতিবিম্ব খুব গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। দীর্ঘ সান্নিধ্যে না থাকলেও তাঁর পরম কল্যাণ হয়েছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা'—এক মুহূর্তের জন্য সজ্জনসঙ্গ হলেও তা ভবার্ণবের পারে যাবার তরণী হয়। কিন্তু সঙ্গটি ঠিক ঠিক ক্ষণে হওয়া চাই। সজ্জনকে সজ্জনরূপে না দেখলে ফললাভ হয় না। যেমন দক্ষিণেশ্বরে পূজারী সেবকরা অহরহ ঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকেছেন, তবু কাজ হয়নি। দিব্যশক্তির প্রভাব তাদের উপর পড়েনি। সর্বত্র ব্রহ্ম রয়েছেন. কিন্তু আমরা ব্রহ্মরূপে দেখছি না, একেই বলা হচ্ছে মায়া। আমাদের দৃষ্টি মায়িক, সর্বত্র থেকেও তিনি আমাদের দৃষ্টির অগোচর। তাঁকে ঢাকা যায় না, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে ঢাকা যায়। সূর্যকে মেঘ ঢাকতে পারে না, আমাদের চোখকে ঢাকতে পারে। আমরা মনে করি সূর্যকে মেঘ ঢেকেছে, তফাত এইখানে।

অবতার যখন দেহ ধারণ ক'রে আসেন, তখন তাঁকে 'মায়ামনুষ্য' বলা হয়। মায়ার আবরণ দিয়ে নিজেকে মানুষরূপে দেখান, তিনি মানুষ হন না। তাই বলা হয়—জন্মগ্রহণ করেছেন। মায়ার দ্বারা অপরের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের স্বরূপকে ঢেকে দিয়েছেন, সর্বত্র মায়াজাল বিস্তার ক'রে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত থেকে নিজেকে ঢেকে দিয়েছেন।

এই মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে মায়াধীশকে ধরতে হবে। গীতায় ভগবান বলছেন, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি

তে' (৭. ১৪)—যারা আমার শরণাপন্ন হয় তারা মায়া থেকে উত্তীর্ণ হয়। শরণাপন্নকে তিনি দিব্যচক্ষু দিয়ে স্বরূপ দেখান। অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে বললেন, 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ।' অর্জুন তখন তাঁকে মহা ঐশ্বর্যশালীরূপে দেখলেন। আরো দেখা যায়, সমস্ত ঐশ্বর্যবিহীন, সর্ব উপাধিবর্জিতরূপে। সে আরো দূরের কথা।

অবতার জন্ম গ্রহণ করেও আমাদের দৃষ্টির বাইরে। যাঁরা ঠাকুরের এই রকম সম্পর্কে এসেছেন, তাঁরা তাঁকে মানুষ ব'লে ভেবেছেন। সেজন্য সাধুসঙ্গ, অবতারের সঙ্গ তাঁদের হয়নি। আর দু-চারজন যাঁরা তাকে চিনতে পেরেছেন, তাঁর পাদপদ্মে নিজেদের সমর্পণ করেছেন, তাঁদের জীবন ধন্য হ'য়ে গিয়েছে। তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে পেলাম।

শ্রীম-স্মৃতিকথা

কথামৃতে প্রথম ভাগের শেষাংশে প্রকাশক গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত করেছেন যা পাঠকের পক্ষে উপযোগী হয়েছে। কারণ যিনি এই অমৃত পরিবেশন করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানার কৌতূহল পাঠকের পক্ষে হওয়া স্বাভাবিক। মহেন্দ্রনাথের পরিচয় খুব সংক্ষিপ্ত হলেও কথামৃতের উপদেশের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর জীবনের কথাগুলি বলাতে তা সকলের পক্ষে খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। মাস্টার-মশাইকে সাক্ষাৎভাবে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এই জীবনচরিত্রটি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। তাঁর সমগ্র জীবনটি ছিল রামকৃষ্ণময়।

আমরাও দেখেছি, মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতেন না। তাঁর অপরিসীম বিদ্যাবত্তার কথা সকলেই জানতেন, তাই তাঁর কাছে নানা প্রসঙ্গ উঠত। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ কেউ তুললে তিনি ঠিক ঘুরিয়ে ঠাকুরের কথা এনে ফেলতেন।

একদিন ঠাকুরের কথা আলোচনা হচ্ছে, এক ভক্ত বললেন, একটু উপনিষদের কথা বলুন! মাস্টারমশাই একটু হেসে বললেন, এই তো উপনিষদের কথা হচ্ছে গো। ঠাকুরের কথা—একি অন্য কিছু, এই তো উপনিষৎ। তিনি উপনিষৎ থেকেই উদ্ধৃতি দিলেন, 'উপনিষদং ভো ব্রূহীতি;' ঋষি বলছেন, 'উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি॥ (কেন—৪. ৭.)—ব্রহ্ম বিষয়ক পরাবিদ্যাই তোমাকে বলছি। উপনিষৎ শব্দের অর্থ—রহস্য, গভীর তত্ত্ববিদ্যা। ঠাকুরের জীবনবাণী ধর্মের রহস্য গভীর তত্ত্ব। মাস্টারমশায়ের বর্ণনা-কৌশল অপূর্ব ছিল, শ্রোতারা অভিভূত হ'য়ে যেতেন. কথামৃত পড়লে আমরা তা বুঝতে পারি। ঠাকুরের কথাগুলিই সেখানে যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে, স্বীয় পাণ্ডিত্য দেখাবার কোন প্রয়াস নেই।

আমরা তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। প্রথমে একটা স্কুলবাড়ী সংলগ্ন ছোট অংশে থাকতেন, পরে সে বাড়ী ছেড়ে মর্টন বিদ্যালয়ের চারতলায় থাকতেন। এরপর ছিলেন তাঁদের আদিবাসস্থানে—যাকে এখন 'কথামৃত ভবন' বলা হয়। যেখানে যখনই তাঁকে দেখেছি, তাঁর মুখে ঠাকুর ছাড়া অন্য কথা শুনিনি। 'আন্ কথা না কহিবি, আন্ চিন্তা না করিবি'—কথাটি যেন অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করেছেন।

প্রথম পরিচয়েই মাস্টারমশাই আপনার ক'রে নিতেন। মঠে কার সঙ্গে পরিচয় আছে, কখন মঠে যাই, সেখানে কি দেখি ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করতেন। যে ব্যক্তি গিয়েছে তার অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে জানতে চাইতেন। তখন স্কুলে পড়ি, এক বন্ধু (পরে দুজনেই সাধু হয়েছি) সহ গিয়েছি। নানা প্রসঙ্গ ক'রে বললেন, গান জানো? আমরা পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, ভাল জানি না, তবে দুজনে একসঙ্গে গাইতে পারি। বললেন, তাই গাও। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন যে গানটি মনে এল সেটি হ'ল—পাতকী বলিয়া কি গো পায়ে

ঠেলা ভাল হয়।' শুনে বললেন, ঠাকুর অত পাপী-তাপী পছন্দ করতেন না, আনন্দের গান গাইবে। আমরা আর একটি গান গাইলাম, গানটি মনে নেই এখন, তাতে আনন্দের অভিব্যক্তি ছিল। শুনে খুশী হলেন। পরে একবার গিয়েছি, চারতলার ছাদে নিয়ে গেলেন, সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলি দেখা যায়। আমাদের দেখাতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, অমুক অমুক বাড়ীটি দেখ, ওখানে ঠাকুর এসেছিলেন। সমগ্র কলকাতার পরিচয় তাঁর কাছে ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে। ছাদ থেকে দিগন্তপ্রসারী আকাশ দেখা যায়। বললেন, ঠাকুর বলতেন, আকাশ দেখলে মনে খুব গভীরভাবে ভূমার স্পর্শ পাওয়া যায়। এমনি নানা কথা বলতেন এবং সকলের সঙ্গে সপ্রেম ব্যবহার করতেন। এই একটি অধ্যায় গেল।

তারপর যখন সাধু হয়েছি তখন অন্যরকম। প্রণাম নিতেন না, জড়সড় হ'য়ে যেতেন। বলতেন, তোমরা সাধু, তোমবা আমাকে কি প্রণাম করবে? তখন থেকে কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না। ঠাকুর সাধুসেবা করতে বলেছেন, তা হ'ক না কেন আমাদের মতো ছেলে ছোকরা সাধু, সাধু তো। যত্ন করতেন আমাদের।

আরো দেখেছি, বাড়ীতে থেকেও অনাসক্তির ভাব, কারো সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই, নিজের ভাবে মগ্ন থাকতেন। স্কুলবাড়ী সংলগ্ন ছোট অংশটিতে একাই থাকতেন। এখন বয়স হয়েছে, অনুরাগী ভক্ত কেউ থাকতেন, দেখাশোনা করতেন। চারতলা বাড়ীতেও প্রথম দিকে একলাই থাকতেন, পরে বাড়ীর লোকেরা আসেন। সর্বদাই আত্মস্থ হ'য়ে থাকতেন, কিন্তু অপরের সম্পর্কে উদাসীন হ'য়ে নয়। সকলের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভগবৎপ্রসঙ্গ করা, এই যেন তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল; সে পরিচয় কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

মঠে যখন আসতেন বেশী গল্প করতেন না। প্রাচীন সাধুরা তাঁকে

সমীহ করতেন। সাধুদের ঘরে যেতেন—তাঁরা কি করেন, কি বই পড়েন, কিভাবে জীবন অতিবাহিত করেন—এই তাঁর দেখার বিষয়। ভক্তদের বলতেন, মঠে গিয়ে কেবল হৈ হৈ ক'রে আস, ওতে সাধুসঙ্গ হয় না। ভোরে সাধুরা যখন ধ্যান-জপ করেন তখন তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ব'সে নিজেকে সে-ভাবে মিলিত করার চেষ্টা করবে।

মঠে সাধুসঙ্গ ছাড়া নির্জন বাসও তিনি করেছেন। কথামৃতে আছে, ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে সাধন-কুটীরে থাকতে বলেছেন। মাঝে মাঝে ভক্তদের নিয়ে পঞ্চবটীর বিল্ববৃক্ষমূলে বসে জপ-ধ্যান করতেন। ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত প্রত্যেকটি স্থান তাঁর কাছে পবিত্র। অমূল্য বস্তু মনে ক'রে পঞ্চবটীর গাছের পাতা, কামারপুকুর গিয়ে সেখানকার মাটি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন। ছোটখাট বিষয়, যা সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি তা অন্যভাবে দেখতেন।

মাস্টারমশাই উত্তরাখণ্ড ইত্যাদি তীর্থস্থানে গিয়ে সাধনা করেছেন—কখন একাকী, কখন-বা ভক্তসঙ্গে। সাধুরা তপস্যায় গেলে অর্থ সাহায্য করা তাঁর অভ্যাস ছিল। সাহায্য হয়তো খুব বেশী নয়, কিন্তু তার মধ্যেও তাৎপর্য আছে। সাধু তপস্যায় যাবে, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য নয়, যা নিতান্ত প্রয়োজন তাই দেওয়া উচিত। সকলকে এক টাকা দিতেন। অবশ্য তখন সাধুর পক্ষে এক টাকা কম নয়। প্রবীণ সাধুদের বরাদ্দ ছিল দু-টাকা, দুজন সাধুকে তিন টাকাও দিয়েছেন। ঠাকুরের ভক্ত বলেই যে মুক্তহস্তে দিতেন, তা নয়। সাংসারিক বিষয়ে তিনি বেশ কৃপণ ছিলেন। ঠাকুরের শিষ্য তো, তিনিও এ-বিষয়ে কম ছিলেন না। তবে প্রয়োজনে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

আবার তিনি শুধু দাতা নন, মাস্টারও। খোঁজ নিতেন কে কেমন জপ-ধ্যান করছেন। সৎ জীবন যাপন, ধ্যান ভজন করছে জানলে আনন্দ বোধ করতেন।

তের

কথামৃত—২।১।১

স্বীয় সাধনকথা

ঠাকুর তাঁর আগেকার তীব্র বৈরাগ্য, ভগবানের জন্য অসাধারণ ব্যাকুলতার কথা ভক্তদের মাঝে মাঝে বলতেন। বলার উদ্দেশ্য তাদের মধ্যেও ঐ রকম তীব্র বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা জাগিয়ে তোলা। এগুলির সংক্রামক একজনের কাছ থেকে আর একজনে সংক্রামিত হয় এবং তাদের ভিতর যা সুপ্ত রয়েছে, তা জেগে ওঠে। এই জন্য ঠাকুর তাঁর আগেকার অবস্থাগুলি বর্ণনা করতো ভক্তদের কাছে। নানাভাবে তাদের মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা জাগাবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গই ছিল না, কচিৎ অন্য প্রসঙ্গ উঠলেও তার পরিসমাপ্তি হ'ত ঈশ্বর-প্রসঙ্গে। ঠাকুর থিয়েটার কি সার্কাসে বা অন্য কোথাও গিয়েছেন. কখনও এগুলির প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি ঐ-সব থেকে সেই দৃষ্টান্ত দিয়ে শিখিয়ে দিতেন মানুষ কিভাবে ভগবৎমুখী হবে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে গেছেন মানুষের অস্থি-পঞ্জর দেখেছেন। বৈরাগ্যের ভাব জাগাবার জন্য ভক্তদের বলছেন—দেহের এই অবস্থা, চাকচিক্য দুদিনের জন্য ; এই ভাবে ভগবানের চিন্তায় সকলকে পৌঁছে দিচ্ছেন।

নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যখন বলছেন, তখন মনে রাখতে হবে, নিজের মাহাত্ম্যকীর্তন করার জন্য বলছেন না। তাঁর ভেতরে ঈশ্বর-প্রেরণাদায়ক যে শক্তি রয়েছে, তার স্পর্শ যাতে ভক্তেরা পায়, সেজন্য বলছেন।

ঈশ্বরের জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁর ছিল, তা বর্ণনা করছেন। মাটিতে আছড়ে মুখ ঘসেছেন এমন ভাবে যে মুখ দিয়ে রক্ত পাত হচ্ছে ; বলছেন, "মা, এখনও দেখা দিলি না'। লোকে ভাবত পাগল অথবা ঠাকুর

বলছেন, ভাবত পেটে শূলবেদনা হয়েছে, তাই এমন ভাবে ছটফট করছে। তাঁর জীবন না দেখলে এই বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত লোকে বুঝবে কি ক'রে? ভক্তরা তাঁর কাছে যখন গিয়েছে, তখন তিনি শান্ত। সমুদ্র শান্ত। উন্মাদনার অবস্থায় ভক্তদের কাছে উপদেশ দেওয়া চলে না, এটা মনে রাখতে হবে। জগন্মাতার যন্ত্র তিনি, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্নরূপে তাঁকে রেখে, এই জগৎকে জগন্মাতা শিক্ষা দিচ্ছেন নানাভাবে।

সাধন ও পূর্ব প্রস্তুতি

অনেকে বলে, 'কত তাঁর নাম করছি, কিছু হচ্ছে না'। কিছু যে হয় না, সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু নাম করার সঙ্গে কি ঠাকুরের মতো তীব্র ব্যাকুলতা, বিরহবোধ, বেদনাবোধ ছিল? যতক্ষণ না সে ভাব আসে, ততক্ষণ তার কৃপা পাওয়া সহজ নয়। এই রকম ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য সাধন জীবনে একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য মনে হবে, এ-সব হলে ভাল হ'ত, কিন্তু হয় কই? ঠাকুরের উত্তর—এগুলি যে হবে, তার জন্য যা প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেগুলি তো করা হচ্ছে না। প্রথম কথা, নির্জনে ভগবৎ-চিন্তা করা, সাধুসঙ্গ করা এবং জীবনটি যাতে সেই ভাবে ভাবিত হয়, তার জন্য একটি পটভূমিকা তৈরী করা প্রয়োজন। অর্জন না করলে কিছু পাওয়া যায় না, দিলেও সে বস্তু রাখা যায় না। এগুলি সাধনলভ্য বস্তু। কেউ বলবে, তিনি দেন না, তাই হয় না। আসল কথা, আমরা চাই কি? আর যদি তিনি দেন, তা ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে কি? মথুরবাবু ঠাকুরকে খুব ধরলেন—তাঁরও ঠাকুরের মতো ভাব হোক।

ঠাকুর বললেন যে মায়েব ইচ্ছা হ'লে হবে। সত্য সত্যই একদিন মথুরবাবুর ভাব হ'ল। তখন উন্মাদের মতো অবস্থা, ঠাকুরকে ডেকে

বললেন, 'বাবা তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, ও তোমারই সাজে।' যে সম্পত্তি অর্জিত নয়, তা দিলেও রাখা যায় না, সাধনজীবনের এটি একটি বিশেষ কথা। দীর্ঘ সাধনার ফলে এটি অর্জন করা যায়।

কৃষ্ণকিশোর

এখানে ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরের কথা বলছেন। তিনি বলতেন 'আমি আকাশবৎ' অর্থাৎ আকাশের মতো নির্লিপ্ত। তিনি বেদান্ত পড়েছেন, তাই নিজেকে 'আকাশবৎ' বলতেন। আকাশের উপর ধোঁয়া উঠছে, আকাশ তার দ্বারা রঞ্জিত হয় না। ধোঁয়া তাকে মলিন করতে পারে না। বাতাসের স্থগন্ধ-দুর্গন্ধ আকাশে কিছু নেই। এদিকে একদিন ঠাকুর দেখেন, ট্যাক্স বাকি পড়ায়, ঘটিবাটি ডিক্রী ক'রে নিয়ে যাবে, তার জন্য কৃষ্ণকিশোর খুব চিন্তিত। তিনি পরিহাস ক'রে বলছেন—"না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায়, তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো!"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, একজনের বিপদ, আর ঠাকুর উপহাস করছেন! কিন্তু উপহাস সাধারণ লোককে নয়। কৃষ্ণকিশোর বেদান্তের সাধক, ঠাকুরের কথার মর্মার্থ বুঝতে পারবেন। কাজের গরমিল রয়েছে কথার সঙ্গে, এই বিসদৃশ ব্যাপারটি যেন ঠাকুর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। 'আকাশবৎ' হ'তে হ'লে কতদূর উদাসীন হ'তে হবে, আত্মস্থ হ'তে হবে, তা 'আকাশবৎ' মুখে বললেও, কৃষ্ণ-কিশোর ধারণা করতে পারেন নি। কৃষ্ণকিশোর কপটতা করতেন না। কিন্তু তত্ত্বকে জীবনে কতদূর রূপায়িত করতে পেরেছেন, তা হয়তো অবহিত হ'য়ে দেখেন নি। ঠাকুর সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তাঁর। মুখে 'আকাশবৎ' বললে হবে না, আকাশবৎ ব্যবহার

করতে হবে। আকাশবৎ হওয়া আর বিষয় চিন্তা করা—এ দুটি বিরুদ্ধ অবস্থা। গীতায় যেমন ভগবান বলছেন,

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ (২. ১১)

মূর্খের মতো কাজ ক'রছ, আর পণ্ডিতের মতো কথা ব'লছ! প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীরা কারো জন্য শোক করেন না। কৃষ্ণকিশোরের কাজে-কথায় মিল নেই মনে ক'রে তার উপর কারো তুচ্ছবুদ্ধি আসতে পারে, তাই ঠাকুর বলছেন একটু আগে, "কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস!···অমন আচারী ব্রাহ্মণ, সেই জল খেলে।" সে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। কুয়োর কাছে একজন দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছে জল চাইতে, লোকটি বললে যে জাতে সে নীচু। কৃষ্ণকিশোর বললেন, তুই বল 'শিব'। 'শিব' 'শিব' বললেই তুই শুদ্ধ হ'য়ে যাবি। নামে এত বিশ্বাস যে সেই জল খেলেন ঐ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণকিশোরের ভাল দিকটি ঠাকুর দেখিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তার উপর কারো তুচ্ছ বুদ্ধি না আসে। কৃষ্ণকিশোরের সাধুর প্রতি যে কত শ্রদ্ধা ছিল, তা ঠাকুর বলছেন: যে 'ঈশ্বর চিন্তা' করে, তাঁর জন্য যে সর্বত্যাগ করেছে তার দেহ সাধারণ দেহ নয়, চিন্ময় দেহ—এতো শ্রদ্ধা ছিল কৃষ্ণকিশোরের সাধুর প্রতি। আবার ঠাকুর তাঁর জীবনের অপূর্ণতার কথাও বলছেন। আচারনিষ্ঠ কৃষ্ণকিশোর ঠাকুরকে খুব শ্রদ্ধা করলেও তাঁর পৈতে ত্যাগ ভাল চোখে দেখেননি। ঠাকুর তাঁর সেই অবস্থা বর্ণনা করছেন, "আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন ক'রে!" ভগবানের জন্য মানুষ যখন এমন পাগল হয়, তখন আর আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অনুষ্ঠান ততদিন, যতদিন না ভগবানের জন্য সেই উন্মাদনা আসে।

আচার-অনুষ্ঠান ও উদ্দেশ্য

ঠাকুর সমাধিস্থ হচ্ছেন, একজন সাধু বলছেন 'আরে এ ক্যা, পহলে তো আসন লাগাও, উস্‌কি বাদ সমাধি করো—অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান—তারপর তো সমাধি। এ রকম সহজ সমাধি সাধুটি দেখেননি। সমাধির কথা পড়েছেন, তার ক্রমগুলি জানেন, তাই বলছেন 'আসন লাগাও'। যদি কারো সহজ স্বাভাবিক সমাধি হয়, তার আর আসন প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। আসন প্রভৃতি হ'ল উপায়। আমরা অনেক সময় উপায়কে উদ্দেশ্য মনে করি। বাইরের শুচিতাকে অবলম্বন ক'রে অন্তরের শুচিতায় পৌঁছতে হয়। কিন্তু অনেক সময়, শুচিতার আতিশয্যে পবিত্রতারূপ আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। শুচিতার বাতিকগ্রস্ত এ-রকম অনেকে আছেন, যাঁরা উপায়কে উদ্দেশ্য ক'রে নিয়েছেন। সব সময় সতর্ক—কোথায় কি অপবিত্র হয়ে গেল। তার দ্বারা যে বস্তুলাভ করতে হবে, সে দিকে এগোচ্ছে কি না, তাতে দৃষ্টি নেই। তার কাছে এই পবিত্র হবার অনুষ্ঠানগুলিই জীবনের উদ্দেশ্য। এইজন্য, ঠাকুর সবসময় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিতেন। কেউ যদি হবিষ্য ক'রে ভগবানের দিকে দৃষ্টি না রাখে তাহলে বুঝতে হবে তার হবিষ্য অখাদ্য। সে যতই হবিষ্যাহারী, তিলকধারী হ'ক না কেন, ভগবানের দিকে যদি মন না থাকে তো এ-সব নিরর্থক। হয়তো সে কপটাচারী নয়, কিন্তু এগুলিকে এত মূল্য দেয়, যাতে এগুলিকেই উদ্দেশ্য মনে হয়। তথাকথিত শুদ্ধাচার মনের শুদ্ধি নয়। হয়তো একটু সাহায্য করতে পারে, কিন্তু কখন কখন বিঘ্নস্বরূপও হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশে আছে স্পর্শদোষ, ছুঁলেই অপবিত্র হ'য়ে যাবে, দক্ষিণদেশে আছে দৃষ্টিদোষ, দেখলে অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। মানুষের মনের এই অবস্থা ভগবানের দিকে না নিয়ে গিয়ে মনকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়, ঠাকুরের উপদেশের এখানে এই তাৎপর্য।

দোষ-দৃষ্টি ত্যাগ

ঠাকুর এর পর তাঁর সাধক জীবনের আর একটি অবস্থার কথা বলছেন। তিনি উন্মাদ-অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতেন। যতীন্দ্র ঠাকুর যখন যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের উপমা দিলেন, ঠাকুর বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে ক'রে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি এ-সব কিছু মনে হয় না!' সদ্‌গুণ চিন্তা করলে মনও সেদিকে যাবে, নিম্নগামী হবে না—ঠাকুর এটি সব সময় মনে করিয়ে দিতেন। আমরা সাধারণতঃ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার জন্য অন্যের দোষগুলি আলোচনা করি। এগুলির উদ্দেশ্য হ'ল—অপরের নিন্দা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যে আমি ও-রকম নই, এতে পক্ষান্তরে আত্মপ্রশংসাই করা হয়। ঠাকুর আমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন এভাবে। আবার সেই অবস্থায় একদিন চড় মারলেন অন্যমনস্ক জয় মুখুয্যেকে, আর একদিন রানী রাসমণিকে। সাধন পথে সকলকে এগিয়ে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ঐ যে অন্যমনস্ক জয় মুখুয্যে ও রানীকে দুই চাপড় দিলেন, এই ভাবটা তাঁর ভাল লাগত না। বলছেন, "তখন মাকে ডাকৃতে ডাক্‌তে ওটা গেল।" ভক্তদের উৎসাহ দিতেন, যাতে তারা সাধন-ভজন করে। কিন্তু ঐ যে শিক্ষকের ভাব, শাসনের ভাব, তা তাঁর ভাল লাগেনি! যীশুখৃষ্টের জীবনে আছে,—ইহুদীদের মন্দিরে গিয়ে দেখলেন **money changer**-এর (পোদ্দার) উপদ্রব অর্থাৎ আমাদের পাণ্ডাদের মতো। তিনি এত বিরক্ত হলেন যে লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে তাদের মন্দির থেকে বিদায় ক'রে দিলেন। বললেন, **ye have made my Father's house a den of thieves**—(আমার পিতার গৃহকে তোমরা চোরের আড্ডায় পরিণত করেছ!) কিন্তু সব সময় তাঁর এমন ব্যবহার ছিল না। ভ্রষ্টাচারী একটি মেয়ের

বিচার হবে, সে দেশের সে যুগের পদ্ধতি অনুসারে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে। যীশুখৃষ্ট এই বিধানের খবর শুনে বললেন, "জীবনে যে কোনও পাপ করেনি, সেই প্রথম ঢিলটি মারুক। এমন কাকেও পাওয়া গেল না, সুতরাং তার আর ও-ভাবে বিচার হ'ল না। যাঁরা অসাধারণ, কখনো তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য বজ্রের চেয়ে কঠোর হন, আবার কখনো হন কুসুমের চেয়ে কোমল।

ঠাকুর তাঁর সাধনাবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলছেন, "ঐ অবস্থায় ঈশ্বর কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে বসে বসে কাঁদতাম।" যে কাশীকে তিনি চিন্ময় দেখছেন, সর্বত্র বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ দর্শন উপলব্ধি করছেন, সেই কাশীতে বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনে তাঁর কষ্ট হচ্ছে খুব। মথুরবাবুদের সঙ্গে কাশীতে গেছেন, সেখানে কাশীর রাজাবাবুরা বসে বিষয়ের কথা বলছেন, ঠাকুরের এত বেদনা বোধ হচ্ছে যে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কাঁদছেন আর বলছেন, 'মা কোথায় আনলি!' দক্ষিণেশ্বরে সেই পরিবেশে বিষয়ীলোক বিষয়ের কথা তোলার প্রসঙ্গ করতে পারত না, আর এ যে বিষয়ীর বৈঠকখানা, তাই ঠাকুর কাঁদছেন।

চৌদ্দ

কথামৃত—২।১।২

এই পরিচ্ছেদের প্রথমে আমরা ঠাকুরকে দেখি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে মগ্ন। তারিখ ১৬ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ। নরেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে মিশছেন খুব বেশীদিন নয়, তাই ব্রাহ্মসমাজের রচিত গানগুলিই গাইছেন। গানগুলি ব্রাহ্মসমাজের হলেও এর ভিতরে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার সবগুলি নিরাকারের চিত্র নয়। "চিদাকাশে হলো পূর্ণ" —গানটির শেষাংশে আছে মায়ের পদতলে ভক্তরা নৃত্যগীতে মগ্ন রয়েছে। গানটির সম্বন্ধে জানা যায়, ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল ঠাকুরের চারধারে নৃত্যগীতরত ভক্তদের দেখে গানটি রচনা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্তন

ব্রাহ্মসমাজের সাধকদের ভিতরেও ঠাকুরের ভাব ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁরা নামগান করতেন, কিন্তু ভগবদানন্দে বিভোর হ'য়ে এই রকম সংকীর্তন তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ভগবানকে মাতৃভাবে আস্বাদন করা ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর কেশববাবুর মধ্যে ফুটে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্যে কেশবচন্দ্র সেন ধর্মবক্তারূপে পরিচিত ছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর লক্ষ্য করেন কেশব সেনের মধ্যে শান্তভাবের পরিবর্তে ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং মাতৃভাবের ভজনা দেখা যাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধানের ফলে তিনি বুঝলেন এটি শ্রীরামকৃষ্ণসংসর্গের ফল। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর মনে ঔৎসুক্য জাগলো। কিছু তথ্য সংগ্রহ করে **Nineteenth Century** পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন—**A Real Mahatma** পরে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁর পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে ম্যাক্সমূলর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন

লেখেন। ম্যাক্সমূলর ঠাকুরকে যে কত শ্রদ্ধা করতেন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বলেছিলেন, আজ আমার মহাদিন! শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদের সঙ্গলাভ সর্বদা হয় না, সাধারণের হয় না!

সংকীর্তনের পর মাস্টারমশায়ের সঙ্গে নরেন্দ্র তখনকার ছেলেদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। ঠাকুর এসে সে-কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। গম্ভীরভাবে মাস্টারমশায়কে বললেন, "এ-সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়।" মানুষের চরিত্রের দোষ আলোচনা করলে কল্যাণ হয় না, গুণের চর্চা করলে কল্যাণ হয়। শাস্ত্র বলছেন: তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ মু. ২.২ ৫—সেই এক আত্মাকে জানো, আর অন্য কথা, অন্য চিন্তা ছেড়ে দাও। মনকে যেভাবে রাখবে সেইভাবে সে ধাবিত হবে। ঠাকুর বলতেন—মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ ফুটে উঠবে। দোষদর্শনের ফলে মনের ভিতর দোষ ঢুকে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, মনকে ঊর্ধ্বগামী করার জন্য এ-সব আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু মন এতে অধোগামী হবে। একজনের দোষ আলোচনা করতে গেলেই আমাদের মন সেই স্তরে নেমে যায়। মা বলতেন, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে না মানে, চোখ বুজে থাকবে তা নয়। তোমার দৃষ্টি এমন কর যে সকলের গুণগ্রাহী হবে, ছিদ্রান্বেষী না হ'য়ে।

মাস্টারমশায়ের স্বপ্ন

ঠাকুরকে ঘিরে ভক্তরা আবার নৃত্য করছেন। কীর্তনান্তে ঠাকুর জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখো?" ভক্তটি মাস্টারমশায় নিজে। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে ঠাকুর বলছেন, "আমার এ কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে!…তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।" মন্ত্র নিতে বলছেন সাধন আরম্ভ করার

জন্য, কারণ ঐ স্বপ্নের দ্বারা মনের একটা অবস্থা সূচিত হচ্ছে। ঠাকুরের কাছেই যে মন্ত্র নিতে হবে, তা বলছেন না।

আমরা অনেক সময়ে স্বপ্নকে বড় বেশী আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি। ঠাকুর বলছেন স্বপ্নকে ওভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। স্বপ্নের দ্বারা দ্রষ্টার মনের ভিতরের অবস্থাটি সূচিত হচ্ছে, তার এখন সংসার সমুদ্রের পারে যাবার আকাঙ্ক্ষা এসেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাটিকে লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর বলছেন, 'মন্ত্র লও'। তাঁর রোমাঞ্চিত হবার কারণ, ভক্তটিকে সাধন-রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটি শুভ সময় এসেছে ব'লে। মন্ত্র নিলে সে একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে সাধন শুরু করতে পারবে। স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের মনে অদ্ভুত ধারণা আছে। স্বপ্নকে সত্য ব'লে ধরে নিয়ে কখনও দুঃখ, কখনও আনন্দ পাই। মনে রাখতে হবে শাস্ত্র স্বপ্নকে সত্য বলে না। স্বপ্ন সম্পূর্ণ অন্তরের বস্তু। মনের ভিতরের চিন্তাগুলি স্বপ্নে ব্যাহ্যরূপ নিয়ে দেখা দেয়। স্বপ্ন স্বপ্নই, তাকে যেন কখনো জাগ্রতের মূল্য না দিই। স্বপ্নে দেখেছি—শিব, কালী, কি ঠাকুর, মা এসেছিলেন, কথা বললেন।

তবে ঠাকুর এখানে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে এত উৎসুক হ'য়ে মন্ত্র নিতে বলছেন কেন? এই স্বপ্নের দ্বারা বোঝা যায় তার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে, না হ'লে মনে এ-সব চিন্তা আসত না, তাই ঠাকুর উৎসুক হয়েছেন এবং বিধিবদ্ধভাবে সাধন আরম্ভ করা প্রয়োজন বুঝে বলছেন, 'মন্ত্র লও'। ঠাকুর নিজে সহজে কাকেও মন্ত্র দিতেন না। এমনকি অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও না। কারও জিহ্বায় লিখে মন্ত্র দিয়েছেন, কাকেও স্পর্শ করায় অধ্যাত্ম জ্ঞান আপনি ফুটে উঠেছে। শাস্ত্রে একে শাম্ভবী দীক্ষা বলে। ঠাকুরের দীক্ষা নানারকমের ছিল, কিন্তু সে-সব না ক'রে তিনি বলছেন, 'মন্ত্র লও'। তার মানে দীক্ষিত হ'য়ে বিধিবদ্ধভাবে সাধন আরম্ভ কর। আমরা যে মন্ত্র নেওয়া বলি, এটা এক রকমের দীক্ষা মাত্র,

তবে একমাত্র পদ্ধতি নয়। যাঁরা মহান্ আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন তাঁরা ইচ্ছামাত্রে ভক্তের হৃদয়ে ভাব সঞ্চারিত করতে পারেন। তাঁদের শ্রুতি-দীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

স্বপ্ন শুনে ঠাকুর কি বুঝছেন তা বলেননি, সুতরাং আমরা নিশ্চিত ক'রে বলতে পারব না যে ঠাকুর এই কথাই বলতে চাইছেন। স্বপ্নে আছে, 'জগৎ জলে জল' ধরে নিলাম এখানে দুস্তর সংসার-সাগর বোঝাচ্ছে। "কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছিল, হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল অর্থাৎ যে সব ছোট নৌকায় নদী পার হওয়া যায় তাতে আর হবে না, জাহাজ দরকার। বিশাল আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সাহায্য দরকার। 'সেই অকূল-সমুদ্রের উপর দিয়ে এক ব্রাহ্মণ চলে যাচ্ছেন'—এই জল পার হওয়া যায়, অনায়াসে পার হওয়া যায় কারণ নীচে সাঁকো আছে। কোথায় যাচ্ছ, প্রশ্ন করাতে উত্তর এল, 'ভবানীপুর যাচ্ছি', 'ভবানীপুর' বলতে কি ভগবানের মাতৃভাবের চিন্তা—'মা ভবানী' বলতে চাইছেন, হ'তেও পারে! ভক্ত বলছেন 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব', উত্তর এল, তোমার নামতে দেরী।" লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে সাধনের প্রয়োজন, এটি হ'লে তবে পৌঁছানো যাবে। অবশ্য, এই স্বপ্ন-বিশ্লেষণ আমাদের মনের কল্পনা।

ভাবমুখে ঠাকুর

পরদিন ভোর হয়েছে, ভক্তেরা ওঠার আগেই ঠাকুর উঠেছেন। দিগম্বর হ'য়ে মধুর স্বরে নাম কীর্তন করছেন। বলছেন, "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান।·· ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী। কখন বা তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি; তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি; তুমিই বিরাট্, তুমিই স্বরাট; তুমিই নিত্য, তুমিই লীলা; তুমিই চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব।" এক ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ ঠাকুর দেখছেন।

ভগবান তাঁর কাছে কেবল নিরাকার, কি কেবল সাকার নন। এই যে তিনিই সব—এই ভাবেতে ঠাকুর সর্বদা থাকতেন। ঠাকুর যখন ছমাস ধরে নির্বিকল্প সমাধিতে ছিলেন, তখন তিনি শুনলেন 'ভাবমুখে থাক্'। লীলাপ্রসঙ্গকার সেই "ভাবমুখে" কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন, সমস্ত ভাবের যেখানে মুখ বা উৎস। 'ভাব' মানে যা কিছু থাকা—'ভূ' ধাতু থেকে 'ভাব' শব্দটি এসেছে। সকল সত্তার যেখানে উৎস অর্থাৎ যা—দ্বৈত-অদ্বৈতের মিলনভূমি। একটা প্রদীপ ঘরের দরজায় বসালে তার আলো ঘরে এবং ঘরের বাইরেও এসে পড়ে। ঠিক সেই রকম, ভাবমুখ অবস্থায় সমস্ত ভাবাতীত স্বরূপের অনুভব হচ্ছে, আবার ভাবেরও অনুভব হচ্ছে। শাস্ত্রে একে দেহলীদীপক-ন্যায় বলে।

এই ভাবমুখে থাকাতে ঠাকুরের মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হয়েছে। তিনি বলছেন, 'তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি',—কিন্তু এই দুটি কি ক'রে এক হবে? ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়. শক্তি সক্রিয়—এ-কথা আমরা জানি, সুতরাং একটি সত্য হ'লে অপরটি মিথ্যা হবে। একটি সত্য আর একটি মিথ্যা বস্তু হ'লে একসঙ্গে কটির প্রতীতি হয়? যেমন, রজ্জুতে যখন সর্প-জ্ঞান হচ্ছে, তখন সর্পই দেখছি; রজ্জু তো দেখছি না—অনুভব হয় দুটির, কিন্তু দুটির অনুভব দুটি রূপে হচ্ছে না, হয় রজ্জুরূপে নয় সর্পরূপে হচ্ছে। এ-অবস্থা ছাড়াও আর একটি অবস্থা আছে. যাতে সাপও দেখছি, দড়িও দেখছি। ঠাকুর বলছেন, যেমন জগৎও দেখছি আবার তাঁকেও দেখছি সর্বত্র। তিনিই চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব হ'য়ে রয়েছেন। এই-যে সব হ'য়ে থাকা, অদ্বৈত বেদান্তের ভাষায় এ হল যুক্তিবিরোধী কথা। একটি আছে—সব নেই, আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, তিনিই সব হয়েছেন। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতভাব সাধক-জীবনের অবস্থানুযায়ী আসে—এ-কথাটি আমাদের বিশেষ ক'রে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন ওঠে সর্ববাদ কি সমভাবে সত্য হ'তে পারে? একই বস্তু—তিনি

ইচ্ছা করলে সাকার, নিরাকার সব হ'তে পারেন। ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব, সর্বশক্তিমত্তাকে আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না, তাই নানা বিবাদের সৃষ্টি হয়। এইজন্য অদ্বৈত-মতে 'এক' বলে এই ভাবাতীতকে বোঝানো যায় না। অদ্বৈত বিশেষণ হিসেবে নয়, এখানে নিষেধবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হ'ল—অর্থাৎ এটি দ্বৈত নয়। অদ্বৈত যে অবস্থা, তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। শব্দের অতীত সেই তত্ত্ব। মন-বুদ্ধির অতীত সেই অবস্থা। ঠাকুর ভাবমুখে ছিলেন, তাই অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, নির্গুণ সগুণ সবভাবে ছিলেন।

ভক্তির বৈশিষ্ট্য

এর পরের চিত্র কালীমন্দির ও রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরতি হচ্ছে। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে, প্রভাতী রাগের লহরী উঠছে নহবত থেকে। ঠাকুর এমন মধুর স্বরে নাম করতেন যে, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাতে পাষাণ গলে যেত!

নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন, ঠাকুর উত্তর-পূর্ব বারান্দার পশ্চিমাংশে দাঁড়িয়ে আছেন। নরেন্দ্রনাথ পঞ্চবটীতে কয়েকজন নানকপন্থী সাধু দেখছেন, সেই প্রসঙ্গে কথা বলছেন। ঠাকুর ও-সব কথায় না গিয়ে বললেন—"তোমরা সকলে একসঙ্গে মাদুরে বস, আমি দেখি।" কি দেখছেন ঠাকুর? দেখছেন, তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারীদের! ঠাকুর আনন্দে দেখতে লাগলেন। সাধনের কথা বলতে লাগলেন। "ভক্তিই সার! তাঁকে ভালবাসলে বিবেক-বৈরাগ্য আপনি আসে।" 'তাঁকে ভালবাসা' এ-কথাটির উপর ঠাকুর খুব জোর দিয়েছেন। সাধনকালে জপ, তপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এ-সবের দিকে সাধকের মন যায়, ঠাকুর সমস্ত প্রকার সাধনের মধ্যে বলেছেন—ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রতি ভালবাসা এলে বিবেক-বৈরাগ্য চেষ্টা ক'রে

আনতে হয় না, আপনিই আসে। তখন আর সংসারের ভোগ্য-বস্তুতে আকর্ষণ বোধ হয় না। বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই আসে, সব 'আলুনী' মনে হয় অর্থাৎ ভাল লাগে না।

সাধনকালে মনে হয় ভক্তির চেষ্টা ক'রব, না আগে বিবেক-বৈরাগ্য লাভ ক'রব? মনে রাখতে হবে বিবেক-বৈরাগ্য, জপতপ, প্রাণায়াম ইত্যাদি এগুলি উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। এই উপায়গুলির দ্বারা তাঁর প্রতি ভালবাসা এলেই উপায়ের সার্থকতা। তা না হ'লে সব বৃথা। তবে এগুলি তুচ্ছ নয়, উপায় হিসাবে এর মূল্য আছে। ভাগবতে আছে, যে ভগবানের শরণ নেয় তার ভগবানে ভক্তি, ভগবৎ-তত্ত্বের অনুভব এবং ভগবান ছাড়া অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য আসে।

ভক্তি বলতে উপায় না উদ্দেশ্য—কি বোঝায়? এ-সম্বন্ধে সাধকরা বলেন দু-রকমের ভক্তি আছে। একটি উপায়, অপরটি উদ্দেশ্য। ভক্তি সাধন ও সাধ্য দুই-ই। সাধনরূপ যে ভক্তি তাকে বৈধী-ভক্তি বলে, অর্থাৎ জপ ক'রব, এই বিধি অনুসারে পূজা ক'রব ইত্যাদি। এই বৈধী-ভক্তি হ'ল উপায়—সাধনস্বরূপ। উদ্দেশ্য হ'ল ভগবানে ভক্তি—তা সাধ্য। ভগবানে ভক্তি এলে উপায়গুলির আর বিশেষ সার্থকতা থাকে না। ঠাকুরের দৃষ্টান্তে আছে, ঝুড়ি-কোদালের দরকার কুয়ো খোঁড়বার জন্য। কুয়ো খোঁড়া হ'লে জল বেরোলে আর ঝুড়ি-কোদালের দরকার নেই। কেউ কেউ ফেলে দেয়, কেউ বা রেখে দেয় অপরের কাজে লাগবে ব'লে।

জপসিদ্ধা গোপালের মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আর জপ করবেন কি না। ঠাকুর বলেছিলেন, "এখন আর তোমার জন্য জপ করতে হবে না, গোপালের কল্যাণের জন্য জপ করতে পারো।" এইটি সাধকের সিদ্ধির পরের অবস্থা। এখন যে ভক্তি তার কোন হেতু নেই, অহৈতুকী ভক্তি। ভক্ত ভগবানকে লাভ ক'রে কি নিয়ে থাকবে?

—ভগবানকে নিয়েই থাকবে। এই ভক্তি পরাভক্তি। আমরা কথায় কথায় অহৈতুকী ভক্তির কথা বলি, সে ভক্তি জ্ঞান হবার পর, ভগবানকে লাভ করার পরই সম্ভব, তার আগে নয়। তারো আগে রয়েছে, তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁকে পাওয়া হ'য়ে গেলে তাঁকে ডাকার আর কোন হেতু রইল না—তখন অহৈতুকী ভক্তি।

তন্ত্রপথ

নরেন্দ্র এরপর তন্ত্রের কথা তুলেছেন। তিনি শুনেছেন, তন্ত্রে স্ত্রীলোক নিয়ে সাধনের কথা আছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। ঠাকুর উত্তরে বলছেন, যে ঐ পথ ভাল নয়, কঠিন পথ এবং পতনও খুব হয়। তন্ত্র-মতে বীরভাবে, মাতৃভাবে ও দাসীভাবে সাধন আছে। ঠাকুর বলছেন, "আমার মাতৃভাব"। দাসীভাবও তিনি ভাল বলছেন, কিন্তু বীরভাব খুব কঠিন এ-কথা বলছেন, সন্তানভাব খুব শুদ্ধ। মা ব'লে ডাকলেই মন শান্ত হ'য়ে যাবে। পরখ ক'রে দেখার জন্য তিনি সব ভাবে সাধন করলেও বিধান দেননি—সেগুলি সাধন করবার জন্য, এ-কথা মনে রাখতে হবে। সব দেখে তাঁর সিদ্ধান্ত: মাতৃভাব, শুদ্ধভাব। মাতৃভাব তাঁর নিজস্ব "ভাব"। বীরভাব খুব কঠিন। এ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সমাজে কখনও প্রকাশ্যভাবে এইভাবের বিধান দেওয়া হয় নি। রহস্য-পূজার মধ্যে এইভাব রয়েছে। সাধক নিজেকে শিব রূপে এবং শক্তিকে পত্নীরূপে কল্পনা ক'রে সাধন করেন, এতে প্রায়ই পতন হয়। তন্ত্রে এ-সাধন সাধারণ সাধকের জন্য নিষিদ্ধ। বীর-সাধকের জন্য বীরভাবের নির্দেশ তন্ত্রে আছে, কিন্তু ঠাকুরের মতে মাতৃভাব শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। বীরভাবে সাধনের মধ্যে একটি আছে বামাচার পথ। ঠাকুর সেটিকে পরিহার করতে বলেছেন। তাঁর রঙ্গরসপ্রিয় সন্তানদের একজন বামাচারী সেজেছে একদিন, নরেন্দ্র রঙ্গ করেই বলছেন, 'আমি

হবো বামাচারী'—তিনি পরিহাস করেই বলছেন, কিন্তু ঠাকুর গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। এত তিনি সতর্ক!

ঈশ্বরের পক্ষে যে সবই সম্ভব এটি ঠাকুর বোঝাচ্ছেন। তুই যোগী ও নারদ ঋষির একটি গল্প বললেন এখানে। ভগবান ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট হাতী প্রবেশ করাতে পারেন। এক ভক্ত এ-কথা শুনে বলছেন, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না।

সপরিবারে মনোমোহন এসেছেন কোন্নগর থেকে, কলকাতা যাবেন। ঠাকুর বলছেন, "আজ ১লা অগস্ত্য, কলকাতায় যাচ্ছ; কে জানে বাপু!" এই ব'লে একটু হেসে আবার অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। ঠাকুর নিজেই হাসতেন, এগুলিকে তাঁর বাই বলতেন। বৃহস্পতিবার খুব মানতেন। একবার মা এসেছেন বৃহস্পতিবার, মাকে ধুলো-পায়েই বিদায় দিয়েছেন। হয়তো মাকে পরীক্ষা করলেন, বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন কিনা দেখার জন্য, জানি না।

লোকশিক্ষা

নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধুদের ঠাকুর বলছেন, ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। শুধু পাণ্ডিত্য আর বক্তৃতাতে হবে না, বিবেক-বৈরাগ্য চাই। হৃদয় মন্দিরে তাঁর প্রতিষ্ঠা কবা দরকার। না হ'লে ভক্তিহীন, বিবেক-বৈরাগ্যহীন আবর্জনাপূর্ণ মন্দিরে ভোঁ ভোঁ ক'রে লেকচারের শাঁখ বাজালে কি হবে? ঠাকুর অনেকবার বলেছেন—আগে ভগবান লাভ, তারপর লেকচার দেওয়া। "আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও।" লোকশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বলছেন, "ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে।"

লেকচার দেওয়া আর তাঁর সম্বন্ধে চর্চা করা কিন্তু এক নয়, এ-কথা মনে রাখতে হবে। লেকচার দেওয়া মানে, আমি যা বলছি তোমরা তা মেনে সেই পথে চল, এ হ'ল অভিমানের কথা। বিনয়ের সঙ্গে তাঁর কথা চর্চা করা, আলোচনা করা সেটি অন্য। যশের জন্য যাঁরা ধর্ম-বক্তৃতা দেন তাঁদের কথা বলছেন এখানে।

মাস্টারকে ঠাকুরের আশ্বাস

"বিবেক-বৈরাগ্য না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না"—ঠাকুরের এই কথা ভেবে মাস্টারমশায় ব্যাকুল হয়েছেন। বিবেক-বৈরাগ্য মানে কি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ?—মনে মনে ভাবছেন তিনি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্ত্রী যদি বলে আমায় দেখছ না, আমি আত্মহত্যা ক'রব"—গম্ভীরভাবে ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন, "অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।" ঠাকুরের এই বিধান সাধারণ লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন, তাই মাস্টারমশায় দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তরাও অবাক্ হ'য়ে গেছেন। ঠাকুর এত কঠোরভাবে বলেন না কখনো, তাই তারা অবাক্ হ'য়ে গেছেন।

ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারমশায়ের কাছে এসে এক আশ্বাসের কথা বলছেন, "যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে—রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হ'লে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।" বলা বাহুল্য, এখানে শুধু স্ত্রী নয়, 'স্বামী-স্ত্রী' উভয়ের কথাই ঠাকুর বলছেন।

মাস্টারমশায়ের সংসারে খুব ভয়। ঠাকুর বলছেন, চৈতন্যদেব বলেছিলেন—"সংসারী জীবের কভু গতি নাই!"

কার গতি নেই? যার ঈশ্বরে ভক্তি নেই, সেই তো সংসারী

লোক। তার গতি নেই। ঈশ্বর লাভ ক'রে সংসারে থাকলে ভয় নেই। সংসার মানে 'আমি-আমার বুদ্ধি'। সংসারী জীব মানে, যে জীব জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বারে বারে যাওয়া-আসা করছে। ভগবদ্ভক্তি অর্জন না করা অবধি তার কোনও গতি নেই। অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থাকলে, ভগবান লাভ ক'রে সংসারে থাকলে কোন ভয় নেই।

পনের

২।২।১-২-৩

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন। আজকের প্রসঙ্গটির বৈশিষ্ট্য একটু বেশী। আজ ভক্তেরা তাঁকে নিয়ে তাঁর জন্মোৎসব করছেন। সমস্ত দিনের বর্ণনা রয়েছে কয়েক পরিচ্ছেদ ধরে। মাস্টারমশায় সকালে এসেছেন, তিনি যা যা দেখেছেন, তা বর্ণনা করেছেন।

ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ উপস্থিত আছেন। ভবনাথ ও কালীকৃষ্ণ গান করলেন—"ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী"। গান শুনে ঠাকুর ভাবস্থ! কালীকৃষ্ণ এবার চলে যাবেন, তাই উঠেছেন। 'শ্রমজীবী শিক্ষালয়ে' তিনি পড়াতেন। ঠাকুর এই চ'লে যাওয়াটা পছন্দ করলেন না। "আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে দেখত? ওর কপালে নাই!"—ঠাকুর আক্ষেপ করছেন। কালীকৃষ্ণ যেখানে যাচ্ছেন তা সৎকাজের জন্য হলেও ভগবানকে নিয়ে আনন্দের তুলনায় তা গৌণ।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা নটার সময় ঠাকুর স্নান করবেন। ঠাণ্ডা লেগেছে, তাই খুব সাবধানে আছেন; গঙ্গায় স্নান না ক'রে তোলা জলে

স্নান করবেন, মাথায় এক ঘটির বেশী জল দেবেন না আজ। এই সাবধানতা কেন? এই যন্ত্র দিয়ে জগন্মাতা লোক-কল্যাণ করাবেন, তাই এত যত্ন ক'রে রক্ষা করা। স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্র প'রে নাম করতে করতে মা-কালীর মন্দির, বিষ্ণুঘর ও শিবমন্দিরে প্রণাম করতে গেলেন। মাস্টারমশায় বর্ণনা করছেন ঠাকুরের দৃষ্টি যেন ডিমে-তা-দেওয়া পাখীর মতো ফ্যালফেলে। ঘরে ফিরে এসেছেন প্রণাম সেরে।

নিত্যগোপাল ও সাবধান-বাণী

রাম, নিত্যগোপাল, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা এসেছেন। নিত্যগোপালকে ঠাকুর স্নেহ করেন, তাঁর পরমহংস অবস্থা—এ-কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। একজন ভক্তিমতী মহিলা বালক-স্বভাব নিত্যগোপালকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন ও মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। নিত্যগোপালের উচ্চ অবস্থা সত্ত্বেও ঠাকুর বলছেন, "ওরে সাধু সাবধান! বেশী যাস্‌নে—পড়ে যাবি।" একেবারে যাওয়া নিষেধ করলেন না; তাঁর মনে কোন সন্দিগ্ধ ভাব ছিল না এঁদের সম্বন্ধে, এ-কথা মনে রাখতে হবে। মনের দুর্বলতা কখন এসে সেই সম্বন্ধকে বিকৃত ক'রে দেবে তাই এই সাবধান-বাণী। এই সাবধনতা সর্বদাই প্রয়োজন। স্ত্রীভক্তেরা বলেছেন, ঠাকুর বেশীক্ষণ তাঁদের থাকতে দিতেন না। তিনি এই ব্যবহার করতেন লোকশিক্ষার জন্য। ঠাকুরের এই সাবধান-বাণী শুধু ছেলেদের জন্যই নয়, মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য; স্ত্রীপুরুষের পরস্পর পরস্পরের থেকে সাবধান থাকা উচিত। শ্রীশ্রীমা তাঁর ভক্তদের বলেছেন, "ভাল খুবই বাসি। তবে শরীর নিয়ে তো আর মেলামেশা করতে পারি না।" তিনি মা, আপনার মা, জগন্মাতা, তবু বলছেন এ-কথা। এই সাবধানতা লোকশিক্ষার জন্য প্রয়োজন।

মায়ের কথা

শাস্ত্রের নির্দেশ—সন্ন্যাসী সব সময় স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকবে। সমাজেও এই ব্যবস্থা প্রয়োজন। যথাসম্ভব একটা ব্যবধান রেখে চলা দরকার। এই সাবধানতা না থাকার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান নষ্ট হ'য়ে গেছে। গান্ধীজী খুব নীতিবাদী ছিলেন। তাঁর সেবাগ্রামে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই থাকতেন আত্মীয়ভাবে। পরে তিনি তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলেন, এটা ভুল হয়েছে এবং সংস্থাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। শাস্ত্র তাই আগে থেকেই সাবধান ক'রে দিচ্ছেন আমাদের। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যে সন্ন্যাসী সে কাঠের মেয়ে হলেও তাকে পা দিয়ে স্পর্শ করবে না। এত কঠোর ভাষায় বলেছেন! অবশ্য এসব কথা সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই বলা হয়েছে, মায়েরা যেন এর থেকে কিছু ভুল না বোঝেন। ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখতে পাই—গোপালের মার কোলে বসছেন। তাঁর তখন গোপাল ভাব। জানবাজারে মথুরবাবুর বাড়ীতে তাঁর পত্নী, মথুরবাবু ও ঠাকুর একই বিছানায় শুয়েছেন। তাঁরা ঠাকুরকে একেবারে শিশুসন্তানের মতো দেখতেন। এ ব্যবহার ঠাকুরের পক্ষেই সম্ভব। আর কারো পক্ষে কি সম্ভব? না এর অনুসরণ করা উচিত?

লোকোত্তর পুরুষের বাক্য অনুসরণ করতে হবে, তাঁদের আচরণ সব সময় অনুসরণ করা যাবে না। ভাগবতে বলছেন, তাঁরা যা করতে বলেন তা করবে কিন্তু যা করেন তার অনুকরণ করতে যাবে না। সব সময় তা কল্যাণকর হবে না। এ-কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। মাস্টারমশায় ঠাকুরের সাবধান-বাণীতে স্তব্ধ হ'য়ে চিন্তা করছেন, শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসকে কেন এত কঠিনভাবে শাসন করেছিলেন! হরিদাসের প্রতি বিরূপ হ'য়ে নয়, লোকশিক্ষার জন্য, সন্ন্যাসের উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তিনি হরিদাসকে ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুরের এই সাবধান-বাণী—'সাধু সাবধান'—মাস্টারমশায়ের মনে খুব রেখাপাত করেছে।

অনাহত শব্দ

ঠাকুর এরপর ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্ব বারান্দায় এসেছেন। বেদান্তের প্রসঙ্গ তুলে এক দক্ষিণেশ্বরবাসী বলছেন অনাহত শব্দের কথা। যা আঘাত থেকে উৎপন্ন হয় তাকে 'শব্দ' বলে। যেমন দুই হাতে তালি দিলে শব্দ হয়, বা একটা লাঠি ঘোরালে বাতাসের সঙ্গে আঘাত লেগে একটা শব্দ হয়। এই আঘাত জনিত শব্দ আমরা অনুভব করি। ঠাকুর বলছেন, "শুধু শব্দ হ'লে তো হবে না; শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছে।" ঠাকুর অনাহত শব্দের কথা বলছেন। অনাহত শব্দ—মূল কারণ, ওঁকারের আদিরূপ। শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয় কি—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' যদি একটি শব্দ হয়, তার প্রতিপাদ্য বিষয় কি? দক্ষিণেশ্বরবাসী বলছেন 'ঐ শব্দই ব্রহ্ম।' ঋষিদের মত এটি, তাঁরা জগৎ-বৈচিত্র্যকে স্থূলরূপে মানেন না। জগৎকারণরূপ শব্দকে মানেন।

রামচন্দ্র ও অবতার-প্রসঙ্গ

ঠাকুর ঋষিদের কথা বলছেন। তাঁরা রামচন্দ্রকে অবতার বা ভগবানের বিশিষ্টরূপে চাননি, অখণ্ডসচ্চিদানন্দকে ভজনা করেছিলেন। কেদার চাটুয্যে এখানে বললেন, "ঋষিরা অবতাররূপে রামকে জানেন নি, তাঁরা বোকা ছিলেন।" ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলছেন, "এমন কথা বলো না। যার যেমন রুচি।" ঋষিরা ছিলেন উচ্চকোটির সাধক, জ্ঞানী, তাই তাঁরা অখণ্ডসচ্চিদানন্দকে চাইতেন। ভক্তেরা অবতার চায় ভক্তি আস্বাদন করার জন্য। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র সভায় যখন এলেন, সকলের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল। ঠাকুর বলতে বলতেই সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভক্তেরা একদৃষ্টিতে এই অপূর্ব সমাধিচিত্র দেখছেন।

অনেকক্ষণ পর সমাধি ভাঙলো। রামের কথা বলতে বলতে

সমাধিস্থ হয়েছিলেন, 'রাম' নাম উচ্চারণ ক'রে তাঁর সমাধি ভঙ্গ হ'ল। ক্রমশঃ সেই লোকাতীত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছেন। ভক্তদের সঙ্গে অবতার প্রসঙ্গ করছেন। অবতার যখন আসেন গোপনে আসেন। দু-চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণ-ব্রহ্ম, পূর্ণ-অবতার এ-কথা সকলে জানত না, কেবল বারজন ঋষি জেনেছিলেন। যার পাকা ভক্তি, সে দুটি জিনিসেরই স্বাদ পেয়েছে। নিত্য অর্থাৎ এই সমস্ত বৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে যে স্বরূপ, যে নির্বিশেষ রূপ তারও স্বাদ পেয়েছে, আবার দেখছে তিনিই লীলা করছেন। লীলাতেও আনন্দ পাচ্ছে। বিজ্ঞানী অবস্থা। ভাগবতে আছে, গোপীরা জানতেন শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ডসচ্চিদানন্দ, কিন্তু তাঁরা লীলাসহচর, শ্রীকৃষ্ণকেই চাইতেন।

ষোল

২।২।৪-৫

বাক্যমনের অতীত অখণ্ডসচ্চিদানন্দ আমাদের সামনে মানুষের রূপে আসেন—এ কল্পনার অতীত! ভগবানের সেই পরিব্যাপ্ত বিশ্বরূপ দেখার শক্তি বা সাহস কার আছে? তাই তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হন; তিনি আসেন বলেই মানুষ তাঁর কাছে যেতে পারে, ভালবাসতে পারে, না হ'লে মানুষের সাধ্য কি বাক্যমনের অতীতকে কল্পনাতেও চিন্তা করা?

ইতিমধ্যে কোন্নগর থেকে ভক্তেরা খোল করতাল নিয়ে সংকীর্তন করতে করতে উপস্থিত হয়েছে। ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য করছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মতো কখন অন্তর্দশা, কখন অর্ধবাহ্যদশা আবার কখনও বাহ্যদশায় রয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবস্থায় এই

রকম হ'ত। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। মাস্টার-মশায় ঠাকুরের অবস্থার মধ্যে যেন শ্রীচৈতন্যদেবের ঐসব ভাব দেখতে পাচ্ছেন।

কিছুপরে নতুন পীতবস্ত্র পরানো হ'ল তাঁকে। এখনও ঠাকুরের তিথিপূজায় বেলুড় মঠে তাঁকে পীতাম্বর পরানো হয়। তাঁর আনন্দময় দেবদুর্লভ পবিত্র মোহন মূর্তি দেখে ভক্তদের সাধ হয় আরো দেখি! আরো দেখি! ঠাকুর আহারে বসলেন, ভক্তেরা আনন্দে প্রসাদ পেলেন সকলে।

আহারের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসেছেন। ঘরে মেঝেতে ভক্তেরা ব'সে আছেন। বাইরে বারান্দাতেও লোক।

নাম-মাহাত্ম্য

একটি বৈষ্ণব গোস্বামী এসেছেন। 'কলিতে উপায় নাম-মাহাত্ম্য' এই প্রসঙ্গ ওঠায় ঠাকুর গোস্বামীকে বলছেন, "নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে; তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? শুধু নাম ক'রে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?" ঠাকুর নামের মাহাত্ম্যের কথায় বেশী জোর দিলেন না; নামের প্রতিপাদ্য বস্তুটি মনে ওঠা দরকার। সাধারণতঃ বলে 'হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা'—অর্থাৎ ভগবানের নাম করলেই হবে। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় অজামিলের। ছেলের নাম নারায়ণ, মৃত্যুকালে তাকে নাম ধরে ডেকেছিল ব'লে উদ্ধার হ'য়ে গেল। 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, তাই মুক্ত হ'য়ে গেল। মানুষের মনে নাম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য বলা হয়। বাস্তবিক জপের সঙ্গে তার অর্থ চিন্তা করতে হয়, শুধু জপ করার কথা শাস্ত্র বলেন নি। যারা সাধন করবে তারা কি শুধু পাখীর মতো নাম উচ্চারণ ক'রে যাবে? যে পাখী সর্বদা 'রাধাকৃষ্ণ' বলছে, বেড়ালে ধরার সময় সেই পাখী ট্যাঁ-ট্যাঁ করে,

রাধাকৃষ্ণ তো বলে না। তার কাছে রাধাকৃষ্ণ শব্দ মাত্র, মন্ত্র নয়, অর্থ নেই তার কাছে; শব্দের তাৎপর্য সে জানে না। নাম-মাহাত্ম্য বলতে বোঝায় বুদ্ধি দিয়ে যখন মন্ত্র বোঝার চেষ্টা ক'রব, বুদ্ধিতে যেভাবে আসে সেই ভাবে সেই নাম চিন্তা ক'রব, নামের মাহাত্ম্য বোঝার চেষ্টা ক'রব। জপ করছি, আর মন হিল্লীদিল্লী ঘুরছে, তা হ'লে কি ঠিক জপ হ'ল? নামের চিন্তা দরকার, যাঁর নাম করছি, তাঁর চিন্তা করতে হবে। যদিও ঠাকুর নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছু ব'লে বিশ্বাসে আঘাত দেন নি। অজামিলের কথায় বললেন, "হয়তো অজামিলের পূর্বজন্মে অনেক কর্ম করা ছিল।"

ঠাকুর আরও বলছেন যে নামের সঙ্গে সঙ্গে 'অনুরাগ' প্রার্থনা করতে হবে। জপ-ধ্যান করার সময়, সাধনকালে এই কথাটি বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে। এই সাধনের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করতে হবে, এ-কথাটি মনে রাখতে হবে। সেজন্য অনুরাগ চাই, চরিত্র চাই। নাম মাহাত্ম্যে এমন বিশ্বাস থাকবে যে মনের উপর কাজ করবে।

মতুয়ার বুদ্ধি

ঠাকুর আমাদের দোষটি দেখিয়ে দিচ্ছেন। আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব, শাক্ত, বেদান্তবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই তাঁকে পাবে। আমার ধর্মটি ঠিক, আর সব ভুল, এটি 'মতুয়ার বুদ্ধি'। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার— এই নিয়ে সেই সময়ে খুব মতভেদ ছিল। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রভাবে অনেকে বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বর এক এবং নিরাকার, অন্য কিছু হ'তে পারেন না। মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভাবও পড়েছিল আমাদের উপর। ভগবানের সাকার-কল্পনার খুব নিন্দা করা হয়েছিল নানাভাবে।

ঠাকুর তাই বলছেন, "যে দর্শন করেছে সে ঠিক জানে 'ঈশ্বর সাকার,

আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, তা বলা যায় না।"

যাঁরা বলেন ঈশ্বর সাকার হ'তে পারেন না, তাঁরা কি ক'রে তা বলেন? নিরাকারের অনুভব কি আছে? যদি অনুভব না থাকে, তা হ'লে তাঁরা কি ক'রে বলেন 'ঈশ্বর দয়াময়'? তাঁর দয়ারূপ গুণ আছে, এ-কথা বেদান্তের দৃষ্টিতে জানা যায় না। তিনি নির্গুণ সুতরাং 'দয়াময়' বলা যাবে না। আমাদের কথার ভিতর ও চিন্তার ভিতর রয়েছে ভুল। নিরাকার কি ক'রে সগুণ হবেন? সগুণ নিরাকারকে কিভাবে চিন্তা ক'রব? মানুষের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে তাঁর বিচার কি ক'রে সম্ভব?

ঠাকুর এভাবে বিচার করেননি। বিভিন্ন ভাবের সাধন করেছেন, সেই সেই সাধন-প্রণালী অনুসারে উপনীত হয়েছেন চরম সিদ্ধান্তে, আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয়। সব পথ দিয়ে তাঁকে লাভ করা যায়। বহুরূপীর উপমা দিয়েছেন। যে গাছতলায় থাকে, সে তার বিভিন্নরূপের উপলব্ধি ক'রে বুঝতে পারে যে সে বহুরূপী। নানা বর্ণ তার, আবার কখনও কোন রঙ নেই, নির্গুণ। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—অন্ধের হাতী দেখা। দৃষ্টিহীন অন্ধ স্পর্শশক্তি দিয়ে হাতীর যে অংশ ছুঁয়েছে, তাই সত্য ব'লে মেনে নিয়েছে। বাস্তবিক সব রূপই সত্য, কিন্তু আংশিক। এই 'আংশিক' কথাটার উপর জোর দিলে আমাদের বিবাদ মিটবে।

ঈশ্বর অবতার হ'য়ে দেহ ধারণ ক'রে আসেন—এও সত্যি, নানারূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন—এও সত্যি, আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ সগুণ নির্গুণ দুই-ই তিনি। সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভক্তিহিমে জল জমে বরফ হ'য়ে ভাসছে, নিরাকার-ব্রহ্মের সাকার রূপ দর্শন হয়; আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে, যেমন জল তেমনি রইল। ব্রহ্মসমুদ্রে ভগবান ভক্তের ভক্তিহিমে সাকার রূপ ধারণ করেন, আবার কখন

জ্ঞানীর কাছে, অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপেতে থাকেন। কোন কোন ভক্তের কাছে তিনি নিত্য সাকার। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—সেখানকার বরফ কখনও গলে না।

কেদার বলছেন, ভাগবতে ব্যাসদেব ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনটি দোষের জন্য : "রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং" তুমি রূপ বিবর্জিত, তোমার রূপকে কল্পনা করেছি। "স্তুত্যানির্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া"—তুমি অনির্বচনীয়, এ-জগতের গুরু, স্তুতি ক'রে তোমার অনির্বচনীয়তাকে খণ্ডন করেছি। "ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা"—তুমি সর্বব্যাপী হলেও তীর্থযাত্রাদি ক'রে তোমার সর্বব্যাপিতাকে খণ্ডন করেছি। তাই ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

ঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।" সাকার-নিরাকারের পার যেখানে, সেখানে বাক্য-মন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। সাধক নিজেরই জন্য বাক্য-মনের অতীতকে বাক্য দ্বারা বর্ণনা করে। অনন্ত, অসীম, বাক্য-মনাতীত ভগবানের এই ভাবটি মনে রেখে, নিজের অপূর্ণতাকে স্মরণ ক'রে বিনীতভাবে তাঁকে চিন্তা করতে হবে। এইভাবে ভাবলে কোন দোষ হবে না।

সাতের

২।২।৬-৭-৮

রাখালের বাবা এসেছেন। ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করছেন। বলছেন, "ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়।"

মাস্টারমশায় ও গিরীন্দ্র নিত্য সাকার নিয়ে আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। নিত্য সাকার ভাবটি ভক্তদের কাছে একটি বিশেষ আদর্শ। ভক্তদের জন্য তিনি নিত্য সাকার হ'য়ে আসেন। তাদের কাছে এই হ'ল চূড়ান্ত, এরপর যে নিরাকারের থাকে যেতে হবে, তা নয়। প্রত্যেকেই নিজের ভাব ও আদর্শ অনুযায়ী ভগবানকে আস্বাদন করবে।

রাজা জনক ও কর্ম

বিকেলে ভক্তেরা পঞ্চবটী মূলে কীর্তন করছেন। মাস্টারমশায় সমস্ত দিনের বর্ণনা দিয়েছেন সুন্দরভাবে। ঠাকুর কীর্তন করছেন, নাচছেন ভক্তসঙ্গে। কীর্তনান্তে ঘরের বারান্দায় ভক্তসঙ্গে ব'সে আছেন। গৃহস্থ ভক্তদের উদ্দেশ্য ক'রে বলছেন, "সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তা হ'লে বাহাদুরী আছে। দেখ জনক রাজা খুব বাহাদুর।...এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসারের কর্ম করছে।" নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করার দৃষ্টান্তরূপে জনক রাজার কথা খুব বলা হয়। পুরাণে আছে জনক রাজা এত বড় জ্ঞানী ছিলেন যে, শুকদেবকে তাঁর কাছে পাঠানো হয় ব্রহ্মজ্ঞান শেখবার জন্য। গীতায় জনকের কথা বলা হয়েছে। জনক জ্ঞান ও কর্মের তরবার ঘোরাচ্ছেন। প্রশ্ন ওঠে, তিনি সাধক না সিদ্ধ? সাধক হলেও জনক সংসারে ছিলেন তাই কর্ম অবলম্বন করেছেন। জনক সিদ্ধ, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েও রাজকার্য করছেন, তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে

কর্মের বিরোধ হচ্ছে না। কর্মের ভিতর তিনি অনাসক্ত রয়েছেন। এক জায়গায় বলছেন, 'মিথিলা যদি পুড়ে যায়, আমার কিছু দগ্ধ হবে না।' 'মিথিলা আমার' এ বোধ তাঁর নেই। 'আমি-আমার' বোধই অজ্ঞানের কারণ। দেহ প্রভৃতির কর্মে তিনি লিপ্ত হন না। তা হ'লে কি জ্ঞানী যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন? তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন, আমি কিছু করি না। সমস্ত লোককে হনন করেও 'তিনি' হনন করেন না। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এটি ভয়ঙ্কর মতবাদ। ঠাকুর সে প্রসঙ্গে বলছেন, পরশমণির স্পর্শে লোহার তরোয়াল সোনা হ'য়ে যায়, তখন তার দ্বারা আর হিংসার কাজ হয় না। সেই রকম জ্ঞানীর দ্বারাও অপকর্ম সম্ভব নয়। জ্ঞানের প্রশংসা করার জন্য শাস্ত্র এভাবে বলেছেন, জ্ঞানের মাহাত্ম্য এমনই যে আর অসৎকর্ম সম্ভব হয় না, জ্ঞানীর পক্ষে।

ঠাকুর এর পর সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার। সাধুর কাছে গেলে ঈশ্বর চিন্তার কথা মনে উদয় হয়। সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

ক্রমে ভক্তেরা গৃহে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলেন।

জ্ঞানী ও ভক্তের কর্মানুষ্ঠান

ব্রাহ্মভক্ত মণিলাল মল্লিক এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক; কাশীতে ব্যবসাদি আছে, তাই গিয়েছিলেন সেখানে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন যে সাধুদর্শন হয়েছে কি না। মণিলাল ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দকে দেখেছেন, সে কথা বলছেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর প্রসঙ্গে বললেন, "এখন উচ্চ অবস্থা কমে গেছে।" ঠাকুর বলছেন ওসব বিষয়ী লোকের কথা। বিষয়ী লোক সাধুর অবস্থা পরখ করেন তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে। অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হ'লে বিষয়ী

লোকের লাভ হবে। সাধুকে পরখ করতে হয় অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখে নয়, তাঁর ভগবৎপ্রেম, বৈরাগ্য—এসব দেখে। ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে, ঠাকুর জানতে চাইলেন। তিনি পাপচিন্তা ত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন শুনে ঠাকুর বললেন, ও এক রকম আছে, "ঐহিকদের জন্য।" যাদের এখন ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার হয়নি তাদের ঐহিক বলছেন। পাপ পুণ্য বিচার প্রথম অবস্থায় দরকার। ভক্ত বা জ্ঞানী এই বিচার ক'রে চলে না। ভক্ত যখন ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন, স্বভাবতই কোন রকম অসৎকর্ম তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় না। সেই রকম জ্ঞানীর পক্ষেও কোন রকম অসৎকর্ম করা সম্ভব হয় না। সৎকর্ম যে করেন, তা যে ভেবে করছেন তা নয়, যা কিছু কর্ম করছেন তাই সৎকর্ম। শুভ-সংস্কারের ফলে অশুভ-সংস্কার দূর হ'য়ে গেছে, কাজেই শুভ-সংস্কারেরই অনুবৃত্তি চলতে থাকে। মন থেকেই অশুভ-সংস্কার চ'লে যাওয়ায় অশুভ-কর্ম সম্ভব হয় না। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের মধ্যে শুভ, অশুভ দুই সংস্কারই রয়েছে, ততক্ষণ শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে আমাদের ভিতরে। তখন চেষ্টা ক'রে মন্দ কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। কিন্তু যাদের চৈতন্য হয়েছে, ভগবানে আন্তরিক ভালবাসা এসেছে, ভগবানকেই কর্তা ব'লে জেনেছে, তাদের ভাব অন্য রকম ঐহিকদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজন পাপ-পুণ্য বিচার ক'রে চলা। কিন্তু যাদের আন্তরিক ঈশ্বরে মন গেছে, তারা পাপ-পুণ্যের পারে।

এই উচ্চ অবস্থাটি আমাদের জেনে রাখা উচিত। কারণ, না হ'লে আমরা যে ধাপে আছি, সেই ধাপেই থেকে যাব। আরো যে এগোতে হবে, তা জানতে হবে। সাধনার কি শেষ আছে? সাধনা করতে করতে দুফোঁটা চোখের জল প'ড়ল, কি একটু আনন্দ হ'ল, তো ভাবলুম আমি কি না হয়েছি! একটুখানি হাঁটা হয়েছে মাত্র, সব পথটাই প'ড়ে

আছে, একথা মনে রাখতে হবে। সাধন পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। একটু আনন্দের আমেজ পেলুম, তাতে হবে না। গভীর নেশায় মত্ত হ'তে হবে। যতক্ষণ তা না হয় বুঝতে হবে সকল পথই বাকি আছে। অনেকে বলে, 'ভগবানের নামে আগে আনন্দ পেতাম, এখন আর তেমন পাই না।' ভগবানের জন্য অসহ্য কষ্ট বোধ হচ্ছে কি না— এইটি হ'ল আসল কথা। এই পথ দিয়ে যেতে হ'লে প্রস্তুতি চাই। পাপকে পরিহার ক'রে পুণ্যকে আশ্রয় করতে হবে। এভাবে পাপের সংস্কার ক্ষয় হ'য়ে গেলে পুণ্যকেও পরে বিসর্জন দিতে হবে। জ্ঞান, অজ্ঞান দু-এর পারে যেতে হবে। যখন অহং বোধ থাকবে না, এই ভাব তখন আসবে। ঈশ্বরকে জানলে তখন বোধ হবে তিনিই সব করছেন। এর আগে যদি বলি 'তিনিই' করাচ্ছেন, সেটা হবে আমাদের মনের সঙ্গে জুয়াচুরি। মন্দ কর্ম করলে নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বলি, কি ক'রব তিনি করালেন।

আন্তরিকতা ও নাম

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, ভাস্করানন্দের সঙ্গে আর কোন কথা হয়েছে কি না। মণিলাল বললেন যে, ভক্তি কিসে হয়, এই প্রশ্ন করাতে বলেছিলেন—'নাম কর, রাম রাম বোলো।' ঠাকুর বলছেন, 'এ বেশ কথা'। অর্থাৎ ভগবানের নাম করতে করতে ভক্তি হয়। ভগবানের নামে ক্রমশঃ মন শুদ্ধ হবে, হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উদয় হবে তখন। বৈধী-ভক্তি করতে করতে রাগভক্তির উদয় হবে। ভক্তির দ্বারাই ভক্তি উৎপন্ন হয়। বৈধী ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হবে, লোক দেখানোর জন্য নয়। এই ভগবৎপ্রেম এক কথায় হয় না, ক্রমশঃ আসে সাধন-পথে চলতে চলতে। আমরা মনে করি, দুবার ভগবানের নাম করলুম, আর আনন্দে বিভোর হ'য়ে যাব, তা হয় না। অথবা বসে থাকব চুপ ক'রে

ভগবানের কৃপায় ভক্তিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠব, তাও হয় না। তিনি কি করবেন না করবেন, তা তিনিই জানেন। আমাকে কি করতে হবে, সেটা আমাকেই ভাবতে হবে। ধর্মে যে পোষাকী ভাব আছে, অর্থাৎ লোক-দেখানো ভাব আছে, ঠাকুর বলছেন সেগুলি ধর্ম নয়। ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ না জাগছে, ততক্ষণ ধর্মজীবন আরম্ভই হয়নি। 'ধর্ম' বলতে আমরা যা ভাবি—জপ, পূজা-পাঠ প্রভৃতি—তুলসীদাস বলছেন: এগুলি হ'ল পুতুল-খেলার মতো। ছোট মেয়ে পুতুল-খেলা করে, কিন্তু যখন বিবাহাদি হ'য়ে যায়, তখন আর পুতুল নিয়ে সে খেলে না। ঠিক সেই রকম, সাধন-ভজন, জপ-তপ এগুলি পুতুল-খেলা মাত্র। যখন আন্তরিক টান আসবে তাঁর জন্য, তখন শুরু হবে ধর্মজীবন।

কলকাতা থেকে কয়েকজন পুরানো ব্রাহ্মভক্ত এসেছেন। তার মধ্যে ঠাকুরদাস সেন একজন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে ব'সে আনন্দে তাদের সঙ্গে আলাপ করছেন। প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। বলছেন, "তোমরা 'প্যাম প্যাম' কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।" এই মহাভাব বা প্রেম সাধারণ মানুষের হয় না। সাধারণের ভক্তি থেকে ভাব পর্যন্ত হ'তে পারে, মহাভাব নয়। প্রেমের দুটি লক্ষণ আছে, জগৎ ভুল হ'য়ে যাবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেমে বাইরের জগতে আর মন যাবে না। দ্বিতীয়তঃ দেহাত্মবোধ একেবারে চ'লে যাবে। দেহকে আমি ব'লে মনে করা দেহাত্মবুদ্ধি, এই বোধ একেবারে চলে যাবে। সাধারণ মানুষ চেষ্টা করে একটু আধটু ভগবানকে ভালবাসতে পারে. কিন্তু দেহ বিস্মৃত হ'য়ে যাওয়া—এটা সহজ কথা নয়। তাই বলছেন ঈশ্বর-দর্শন না হ'লে প্রেম হয় না। তার আগে সাধন ভজন ক'রে ভাব-ভক্তি পর্যন্ত হ'তে পারে। ঈশ্বর-দর্শন যে হয়েছে, তার কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাত্ত্বিক লক্ষণ ফুটে ওঠে তার আগে। বিবেক বৈরাগ্য দেখা যায়, জীবে দয়া,

সাধু-সেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণ-কীর্তন, সত্যকথা এই সব সাত্ত্বিক লক্ষণ ফুটে ওঠে। এগুলি অনুরাগের ঐশ্বর্য,—অনুরাগ মানে শুধু চোখের জল ফেলা নয়। এই ঐশ্বর্য প্রকাশ পেলে বোঝা যায়—'ঈশ্বর' দর্শনের আর দেরী নেই।

এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করছেন বিচারের দ্বারা কি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করতে হবে? ঠাকুর বিচার পথকে অস্বীকার করলেন না। কিন্তু খুব বেশী প্রাধান্য দিলেন না। বলছেন, "ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়।" ভগবানের প্রতি ভালবাসা এলে বিষয়সুখ আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটেগুড় ভাল লাগে না। বিষয় তখন আপনিই তুচ্ছ বোধ হয়। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন, "যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সুখের দিকে কি মন থাকতে পারে?" সেই বিষাদ এত তীব্র, অন্যদিকে মন যায় না! এক ভক্ত বলছেন,—"তাঁর নাম করতে ভাল লাগে কই?" খুব স্বাভাবিক কথা, তাঁকে ভালবাসতে পারছি কই? তাঁকে ভালবাসলে অন্য সব আকর্ষণ দূরে চ'লে যায়, এ কথাটি বেশ বোঝা গেল। কিন্তু ভালবাসা হচ্ছে কই? ঠাকুর উত্তরে বলছেন, "ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।" কথাগুলি এতো সহজ যে সহজে আমাদের বিশ্বাস হয় না! সত্যই কি প্রার্থনা করলে তাঁর নামে রুচি হবে? ঠাকুর বলছেন যদি তাঁর নাম করতে করতে অনুরাগ বাড়ে, আনন্দ হয়, তাহলে তাঁর কৃপা হবেই হবে। ভগবানের অসংখ্য নাম, যে নাম ভাল লাগে, সেই নামটি ক'রে যেতে হবে। জীবের বিকার রোগ হয়েছে, নামে অরুচি! যদি একটু ইচ্ছা থাকে তাহলে বাঁচবার খুব আশা। তাঁর কৃপা লাভ হবে।

ভাবগ্রাহী জনার্দন। মনটি তিনি দেখেন, আন্তরিকভাবে তাঁর

নাম ক'রে যেতে হবে। কর্তাভজারা মন্ত্র দেবার সময় বলে, 'মন তোর'। অর্থাৎ মন দিয়ে নাম করলে ফল লাভ হবে। 'যার ঠিক মন তার ঠিক করণ'—তাঁর নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস ক'রে সাধন করতে হয়। আমি তাঁর নাম করেছি, আমি কি না পারি! এই বিশ্বাস প্রয়োজন।

যতক্ষণ অহঙ্কার রয়েছে, ততক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় না। নিজেকে কর্তা ব'লে বোধ হচ্ছে, তাঁকে কোথায় স্থান দেব? নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়, বিনীত হ'তে হয় না, হ'লে ভগবদভাব মনে আসে না। সাধুসঙ্গের খুব প্রয়োজন। "একটু কষ্ট ক'রে সৎসঙ্গ করতে হয়।" একটু কষ্ট ক'রে কারণ প্রথমটা হয়তো মন যাচ্ছে না, তাই জোর ক'রে যেতে হয়। বাড়ীতে প্রতিকূল পরিবেশ, তাই জোর ক'রে সাধুসঙ্গ করতে হয়।

এর পর বলছেন, বড়লোকের বাড়ীতে সব ঘরে আলো থাকে, গরীবরা অত আলোর ব্যবস্থা করতে পারে না। অন্ধকারে থাকে। এই দেহমন্দিরে জ্ঞানের আলো জেলে রাখতে হবে। তাঁকে সকলেরই অধিকার; তাঁর শরণাগত হ'লে সর্বশক্তির আধার যিনি তাঁর সঙ্গে যোগ হ'য়ে যেতে পারে। প্রত্যেকের ভিতর সেই পরমাত্মা রয়েছেন, তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছি, তাই নিজেদের ক্ষুদ্র, অল্পশক্তি বলে মনে হয়। যোগ হলেই চৈতন্যস্বরূপ হ'য়ে যাব। যার চৈতন্য হয়েছে তার ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। চাতক পাখি বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল খায় না।

আঠার

২।৩।৪-৫

রামলাল ও কালীবাড়ীর একটি ব্রাহ্মণ-কর্মচারী পরস্পর তিনটি গান গাহিবার পর ঠাকুর ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে বলছেন। বাঘ যেমন জানোয়ারদের খেয়ে ফেলে সেইরকম ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কাম-ক্রোধ এইসব রিপুদের খেয়ে ফেলে। অনুরাগ এলে এগুলি আর থাকে না। গোপীদের কৃষ্ণের উপর ঐ অনুরাগ হয়েছিল। অনুরাগ কি রকম, তা বলছেন,—অনুরাগ-অঞ্জন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুরাগের আবেগে প্রত্যক্ষ হয়। শ্রীমতী চারদিক কৃষ্ণময় দেখছেন। বদ্ধজীব একবারও ভগবানের কথা ভাবে না। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশীভূত, এই সংসারী জীব দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। বদ্ধজীব যেন গুটিপোকার মতো, নিজের লালা দিয়ে জাল তৈরী করেছে, সেখান থেকে বেরুতে চায় না। মানুষ কেন নিজে বদ্ধ হ'য়ে মৃত্যুকে বরণ করে এভাবে? উত্তরে ঠাকুর বলছেন, "মায়াতে ভুলিয়ে রাখে।" মানুষ নানা রকমের হয়। সাধনসিদ্ধ অনেক সাধন-ভজন ক'রে অগ্রসর হয়, যেমন কষ্ট ক'রে জমিতে জল এনে ফসল ফলায়। কৃপাসিদ্ধ আলাদা থাকের। বৃষ্টির জলে এমনিই ফসল ফলে, জল আনতে হয় না। তাঁর কৃপায় অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করে। সে কিন্তু দু-এক জন। প্রশ্ন ওঠে, সাধন করার প্রয়োজন কি, সবাইকে তিনি কৃপা ক'রে সিদ্ধি দেন না কেন? ভগবান কি করবেন, তা তিনিই জানেন। আমার কি করণীয় জেনে কৃপা লাভ করতে হ'লে সাধন-ভজন করতে হবে। আমরা যদি সিদ্ধি কামনা করি, তা হ'লে সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য যা করণীয়, তা করতে হবে। যদি তিনি কৃপা ক'রে সাধন ছাড়াই উদ্ধার করেন, সে তাঁর ইচ্ছা।

আর এক রকম আছে, নিত্যসিদ্ধ। তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান-চৈতন্য হ'য়ে আছে। তাদের সব করা আছে, ভিতরে জ্ঞানভক্তিপূর্ণ; কেবল একটু সময়ের অপেক্ষা, সুযোগ এলেই ভিতরের জ্ঞান ভক্তি প্রকাশ পায়। এঁরা অবতারের সঙ্গে আসেন।

গোপী-অনুরাগ

ঠাকুর বলছেন, গোপীদের কি অনুরাগ, কি ব্যাকুলতা কৃষ্ণের জন্য। গোপীভাবের গান শুনতে শুনতে তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। চারদিক কৃষ্ণময়' দেখছেন। আবার সমাধিস্থ হলেন। ভক্তেরা মহা-ভাবময় ঠাকুরের সে রূপ দেখছেন।

সমাধিভঙ্গের পর কথা বলছেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর আপন মনে কথা ব'লে যাচ্ছেন। নিজের মন থেকে প্রশ্ন উঠছে, নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন। বিষয়ী লোকের জ্ঞান এক একবার দীপশিখার মতো দেখা দেয়। তার পরই বলছেন, "না, না, সূর্যের একটি কিরণের ন্যায়, ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা,—অনুরাগ নাই।" বিনা অনুরাগে ঈশ্বরের নাম করে বিষয়ীরা। ঈশ্বরবস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, অনুভব নেই। সাধনে কোন রোক্ নেই, অর্থাৎ জোর নেই। জীব কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করবে। ঠাকুর একটি গান গাইছেন, "দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"—আমার কর্মফলে আমিই ভুগছি।

আমি-আমার বোধ ও মৃত্যুভয়

ঠাকুর এরপর বলছেন, "আমি আর আমার অজ্ঞান"—এই যে আমাদের "আমি আমার বোধ" এটি সর্ব দুঃখের কারণ। বাস্তবিক,

আমির গণ্ডীটুকু ভেঙে দেওয়া যায় যদি, তা হ'লে আমিকে কোথাও পাব না। একমাত্র তিনিই আছেন। এই অনিত্যবস্তুর আড়ালে রয়েছেন তিনি। বিচার ক'রে দেখা যাবে আমি শরীর? না হাড়, না মাংস? না অন্য কিছু?—এ সব কিছুই নয়, কোন উপাধি নেই আমাতে।

উপাধি হচ্ছে বিশেষ রূপ, যা দিয়ে তাঁর থেকে আমরা নিজেকে পৃথক্ করেছি। দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে আরোপিত হচ্ছে। আমি স্থূল বা কৃশ,—এই স্থূলতা কৃশতা হল দেহের ধর্ম, আত্মাতে আরোপিত হল; বলছি আমি অর্থাৎ আত্মা স্থূল বা কৃশ ইত্যাদি। সেইরকম ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, মনের ধর্ম আত্মাতে আরোপিত হচ্ছে। এগুলি আত্মার ধর্ম নয়। আত্মার পাপও নেই পুণ্যও নেই, সমস্ত গুণের দ্বারা অস্পৃষ্ট তিনি।

ঈশ্বর দর্শন হ'লে বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়। সেখানে বিচার আর আসে না। প্রত্যক্ষ যেখানে হয়েছে সেখানে প্রশ্ন আসে না। ঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বর লাভ করেছে, অথচ বিচার করছে, তাও আছে।" জ্ঞান লাভের পরও কারো বিচার থাকে অপরের জন্য। নিজের অনুভবকে অপরের গোচরে আনার জন্য, বিচার ক'রে ক'রে সেই তত্ত্বকে তাদের মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করেন। শঙ্করাচার্য প্রভৃতির বিচার ছিল অপরকে সেই তত্ত্বে পৌঁছে দেবার জন্য। কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর গুণগান করছেন। ঈশ্বর লাভের পরও নাম গুণগান করছেন, তাঁকে আস্বাদ করার জন্য। এই সব উপলব্ধির প্রকাশ যদি না থাকে তা হ'লে সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁকে জানার কোন উপায় থাকে না। তাঁদের অন্তরের আনন্দের বাহ্য প্রকাশ যদি না থাকত, তা হ'লে মানুষ সে আনন্দের অনুমান পর্যন্ত করতে পারত না।

ঠাকুর বলছেন, "তিনিই সব হয়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশী

প্রকাশ।" মানুষের মধ্যে চৈতন্যের খুব স্পষ্ট অভিব্যক্তি রয়েছে। আবার মানুষের মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্বের ভিতর তাঁর প্রকাশ অতি স্পষ্ট। জ্ঞানীকে এজন্য ভগবান আত্মস্বরূপ বলছেন।

অধর সেন তাঁর বন্ধু সারদাচরণকে নিয়ে এসেছেন। বন্ধুর ছেলে মারা গেছে, ঠাকুরের কাছে পুত্রশোকের কথা নিবেদন করলেন। ঠাকুর আপনার মনে গান গাইছেন—"জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।" এ সংসার যুদ্ধক্ষেত্র, যোদ্ধা রূপে কাল এসেছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। মৃত্যু যে অবধারিত, তাকে ভুলে থাকি ব'লে, সে যখন আসে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। জ্ঞান-ভক্তির সাহায্যে নিজেকে দৃঢ় করতে হবে, নিজের স্বরূপ জেনে তাকে অতিক্রম করতে হবে। এছাড়া পথ নেই। কাল ঘরে প্রবেশ করেছে, তাঁর নামরূপ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ করার কথা প্রথমে বললেও পরে আবার বলছেন, "যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি;···তাঁকে আমমোক্তারি দাও।"

পূর্ণ শরণাগতির বোধ থাকলে যুদ্ধ করতে হবে না। 'আমি' যতক্ষণ, যুদ্ধ ততক্ষণ, ঠাকুর পুত্রশোকে কাতরকে শুধু উপদেশই দিলেন না, তাঁর দুঃখ ঠাকুরকে স্পর্শ করেছে, তাই বলছেন, 'শোক হবে না গা?' তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন,—সাধারণ মানুষের দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করেছে। মানুষ কি করবে, তা হ'লে এই হতাশায় ডুবে মরবে? তারপর ঠাকুর বলছেন—'এ সব অনিত্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান দু-দিনের জন্য।' জগতের অনিত্যত্ব বোধ হ'লে দুঃখ থাকে না। জগৎ শব্দের অর্থ, যা চ'লে যায়, নশ্বর। যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য দুঃখ ক'রে কি হবে?

ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—তিনটি কাজ করছেন। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় যখন সব ধ্বংস হ'য়ে যায়, কেবল সৃষ্টির বীজগুলি মা কুড়িয়ে রাখেন, নতুন সৃষ্টির জন্য। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আমরা আবদ্ধ, তাই গণ্ডীর

ভিতরের কিছু হারালেই আমরা অধীর হ'য়ে উঠি। সমস্ত বিশ্বে কিছুই থাকবে না। এই বিশ্ব একটি বুদ্‌বুদের মতো, তার চেয়ে বেশী স্থায়ী নয়। জল থেকে বুদ্‌বুদ ওঠে, একটু থেকেই নিঃশেষ হ'য়ে যায়। এই জগৎও যেন অনন্ত-কালের একটি বুদ্‌বুদ দু-দিনের জন্য উঠেছে, আবার তাতেই লয় পাবে। এ-কথা আমরা ভাবতে পারি না। কালের স্রোতে কুটোর মতো মানুষ ভেসে যাচ্ছে। কখনো দু-চারটে এক সঙ্গে হচ্ছে, আবার একটু পরে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কে কোথায় চ'লে যাচ্ছে। আমরা কুটোর মতো স্রোতে ভাসছি, তবুও সুখস্বপ্ন দেখছি! আলাদা হ'য়ে গেলেও আবার এক হবো—এ কল্পনার দ্বারা দুঃখকে ভোলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এটা পথ নয়। অনিত্যকে অনিত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া এবং যে বস্তুকে বাস্তব ব'লে মেনে নিয়ে মনকে সরল করা, এই হচ্ছে উপায়। সম্পূর্ণ রূপে বাসনা ত্যাগ করতে পারলে 'আমি আমার' বুদ্ধি ত্যাগ করতে পারলে, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ভেঙে দিতে পারলে, আর কোনো দুঃখ নেই। "অনিত্য জগৎ অনিত্যই থাকবে, আমার তাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।" এই ভাবটি দৃঢ় ক'রে রেখে মানুষ যদি সেই ভাবে আত্মস্থ হ'তে পারে, তা হ'লে তার কোন ভয় নেই। সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, সে নিত্য শাশ্বত, অজয় অমর। মানুষ যখন জানবে সে অমর মৃত্যু তখন তার উপর আধিপত্য করতে পারবে না। 'ত্বমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—তাঁকে জেনেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে; এ ছাড়া পথ নেই।

অধর সেন ও সংসারের আকর্ষণ

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় কথা বলছেন। অধরের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয়েছে অল্পদিন হ'ল। এটি দ্বিতীয় দর্শন।

দেড় বছর পর তিনি মারা যান। ঠাকুর যেন তাঁর ভবিষ্যৎ দেখেই উপদেশ দিচ্ছেন, "সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে। কিছু কর্ম করা দরকার—সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ ক'রে নিতে হয়।"

অধর সেন ডেপুটি। তাঁকে বিশেষ ক'রে ঠাকুর মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই পদ তিনি পেয়েছেন। মান সম্ভ্রম পেয়ে আমরা যেন তাঁকে ভুলে না যাই। 'দু-দিনের জন্য এই সংসারে আসা', ঠাকুর সংসারের এই অনিত্যত্ব যেন বিশেষ ক'রে অধরের মনে প্রবেশ করানোর জন্য বলছেন কথাগুলি। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সংসারে স্থায়িভাবে বাস করবার জন্য আমরা আসিনি। ঈশ্বর-লাভের জন্য এই মানবদেহ ধারণ; যে উদ্দেশ্যে আসা তা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে বৃথা এ দেহ ধারণ। 'হচ্ছে, হবে'—'করছি, ক'রব' ব'লে ফেলে রাখলে চলবে না। সাধন করা একান্ত দরকার। এই জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা, সেটি মনে রেখে কর্ম করা দরকার। স্যাকরা যেমন সোনা গালাবার সময় সব রকম উপায় অবলম্বন করে যাতে আগুন খুব জোর হ'য়ে সোনাটা তাড়াতাড়ি গলে। তার আগে সে তামাক খাবার অবসর পর্যন্ত পায় না। ঠিক সেই রকম, আমাদেরও আগে ভগবান লাভ করতে হবে। ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, একটা ঘরে সোনা রয়েছে, মাঝে একটা দেওয়ালের ব্যবধান,—যে চোর, সে কি নিশ্চিন্তে ব'সে থাকবে না, প্রাণপণ চেষ্টা করবে, কি ক'রে দেওয়াল ভেঙে সে ঐ সোনা নিয়ে আসতে পারে। আমরা এই মানবদেহ ধারণ ক'রে তাঁর চিন্তা করার সুযোগ যখন পেয়েছি, তার সাধ্যমত সদ্ব্যবহার ক'রে নিতে হবে তাড়াতাড়ি। এই কাজ শেষ করার জন্য আমাদের ভিতর যেন ব্যাকুলতা আসে, প্রাণ যেন ছটফট করে। তা না হ'লে আলস্য ক'রে যদি ভাবি এত তাড়া কিসের, তা হ'লে কাজ শেষ হবে না

কোনদিন। ঠাকুর বলছেন, "খুব রোক্ চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

সংসারে নানা আকর্ষণ রয়েছে, এই জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে খুব সাবধানে থাকতে হয়। তাঁর নামের খুব শক্তি, অবিদ্যা নাশ করে। ত্যাগীদের তত ভয় নেই, ভোগের বস্তু থেকে তারা দূরে আছে। কিন্তু শুধু ভোগের বস্তু থেকে দূরে থাকলেই হ'ল না। ঠাকুর আরো বললেন, "ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখতে পারে।" 'সাধন থাকলে' কথাটি মনে রাখতে হবে। অনেক সময় এক একজনের জীবন দেখা যায়। খুব যে ভোগের মধ্যে আছে তা নয়। কিন্তু জীবনটা যেন অর্থহীন, গতানুগতিক ভাবে চলে যাচ্ছে। এতে ত্যাগের যে ফল তা লাভ হচ্ছে না, সুতরাং সাধন থাকা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ত্যাগ মানুষকে সিদ্ধি দিতে পারে না। ত্যাগ উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। এই উপায় অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরে মন রাখতে হবে। যে ত্যাগ মনকে ভগবানের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য না করে তার কোনা সার্থকতা নেই। ত্যাগের সঙ্গে সাধন প্রয়োজন। ভগবানে অনুরাগ এই সঙ্গে বাড়ছে কি না দেখতে হবে, না হ'লে শুধু ত্যাগ অর্থহীন।

ঈশ্বরীয় অনুরাগ

বৈরাগ্য সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, বিষয়ে বিরাগ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে নানা কারণে। আঘাত খেয়ে অথবা ভোগের বস্তু নাগালের বাইরে বলে আমরা অনেক সময় তার থেকে দূরে থাকি। কিন্তু তার দ্বারা ভগবানে অনুরাগ জন্মায় না। ভগবানে অনুরাগ না এলে যথার্থ বৈরাগ্য আসে না। ঠাকুর মর্কট-বৈরাগ্যের কথা অন্যত্র বলেছেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় বৈরাগ্য, বাস্তবিক তা

বৈরাগ্য নয়। যেমন একজনের চাকরি হচ্ছে না, সে বিফল হ'য়ে বৈরাগী হ'য়ে কাশী চলে গেল। সেখানে যখন একটি চাকরি পেল, তার বৈরাগ্য তখন চলে গেছে। এটি মেকি বৈরাগ্যের রূপ। ঠিক ঠিক ত্যাগী যে, তার মন কখনও বিষয়ে আসক্ত হয় না। যে সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে আছে, তার মন কখন ঈশ্বরে যায়, আবার কখন কখন কামিনী-কাঞ্চনেও যায়। এক একবার বেশ ভগবানের কথা ভাবছে, আবার কখন বিষয়ের দিকে মন চলে যায়। যেমন মাছি বিষ্ঠাতেও বসে, পচা ঘায়েও বসে, আবার সন্দেশেও বসে। সাধারণ মানুষের মন এই রকম। কিন্তু মৌমাছি কেবল ফুলে ব'সে মধু পান করে অর্থাৎ প্রকৃত ত্যাগীর মন সর্বদা ঈশ্বরে রয়েছে। মনকে সর্বদা ঈশ্বরে রাখতে হবে। তাই প্রথমে একটু রোক্ ক'রে খেটে নিতে হবে। সাধন চাই। ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে, তার উপর মনের মধ্যে বিষয়ের প্রবল আকর্ষণ, সেইজন্য মনকে বিষয় থেকে দূরে রাখতে হবে।

তন্ত্রে তিন রকম সাধনের কথা বলেছে—পশুভাব, বীরভাব ও দেবভাব। 'পশু' মানে ছাগল-গরু নয়, পশু মানে ইন্দ্রিয়ের দাস। সাধারণ জীব, সাধারণ মানুষ 'পশুভাবের সাধন' অবলম্বন করবে। সাধারণ ব্যক্তির প্রলোভনের বস্তু থেকে দূরে থাকা উচিত, তা না হ'লে মনকে সেদিকে কখন টেনে নেবে, তার ঠিক নেই। যুদ্ধ করা খুব কঠিন, কখন পারছে, কখন পারছে না—এই রকম তার অবস্থা হয়। তাই বলা হচ্ছে দূরে থাকতে। বীরভাবের সাধক প্রলোভনের বস্তু থেকে দূরে যায় না, লড়াই করে সে, তাই তাকে 'বীর' বলা হয়। বীর প্রলোভনের মধ্যে থেকে প্রলোভিত না হ'য়ে যুদ্ধ করে, তার নিজের বীরত্বের প্রতি আস্থা আছে। সংগ্রাম ক'রে সে এগিয়ে চলে তার পথে। দেবভাবের সাধক দেবভাবাপন্ন হওয়ায় প্রলোভনের বাইরে বা

ভিতরে থাকলেও মন সর্বদাই ঈশ্বরে রয়েছে। ভোগের বস্তুতে মন কখনই আকৃষ্ট হয় না—এই ভাবের সাধকের। এই দেবভাব—এটি সাধারণের কথা নয় এবং এ-রকম ব্যক্তি খুব বিরল এ-জগতে। সংসারে বিষয়ের আনন্দ, ইন্দ্রিয়ের আনন্দ তার মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। বীরভাবের উপযুক্ত সাধকও অল্প আছে। তন্ত্রে প্রধানতঃ সাধারণের পথ ব'লে পশুভাবকেই বলা হয়েছে। আমরা যেন নিজেদের উপর খুব ভরসা ক'রে বীরভাবের সাধনা করতে না যাই, গেলে পতনের আশঙ্কা আছে, এ-কথা মনে রাখতে হবে।

উনিশ

২।৪।১

সুরেন্দ্র ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের একজন। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ, ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়ীর উঠানে ব'সে আছেন। তাঁকে একটি তাকিয়া দেওয়া হ'লে তিনি তাকিয়াটিকে সরিয়ে দিলেন। বলছেন, "তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা! কি জানো? অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার ক'রছ, অভিমান কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে।" অর্থাৎ সভার মধ্যে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসা, মানে আমি সাধারণ লোক নই। যদি তাকিয়া না দেয় বলবে, একটা তাকিয়া দিলে না? অভিমান সহজে যায় না। বিচার ক'রে সরিয়ে দিলেও আবার এসে উপস্থিত হয় কখনও। উদাহরণ দিলেন কাটা ছাগলের। তাকে কেটে ফেলা হয়েছে, তবু তার হাত-পা নড়ছে। আরো একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন, স্বপ্নে

ভয় পেয়েছে, ঘুম ভেঙে গেল, জেগে উঠেও ভয়-ভয় করে, অর্থাৎ অভিমান তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, আমায় খাতির করলে না। ঠাকুর বলছেন, "আমি ভক্তের রেণুর রেণু"। অভিমান নেই।

কলকাতার বড় আদালতের উকিল বৈদ্যনাথ এসেছেন, সুরেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি ঠাকুরকে কিছু প্রশ্ন করবেন ব'লে এসেছেন। প্রশ্ন করার আগেই ঠাকুর নিজে থেকেই বৈদ্যনাথকে বলছেন, "যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর শক্তি। তবে একটি কথা আছে, তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয়। ঈশ্বর বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন; কেবল শক্তিবিশেষ।" তাঁরই শক্তিতে সব হচ্ছে, তবে তাঁর শক্তি সর্বত্র সমান নেই, শক্তির তারতম্য রয়েছে। সর্বভূতে যদিও তিনি বিভুরূপে আছেন অর্থাৎ বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, সেই দিক থেকে সব সমান। কিন্তু শক্তির প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন, কারো ভিতর শক্তির প্রকাশ বেশী, কারো ভিতর কম।

স্বাধীন ইচ্ছা

বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করছেন, "Free will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা—মনে করলে ভাল কাজও করতে পারি, মন্দ কাজও করতে পারি, এটা কি সত্য? সত্য সত্যই কি আমরা স্বাধীন?" এই প্রশ্নটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে অনেক সময় বিব্রত করে। কেউ বলে, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব ঘটছে।" কেউ বলে, "আমরা স্বাধীনভাবেই সব করছি।" কোনটি ঠিক? শাস্ত্র বলছেন 'ভাল কাজ কর'। প্রশ্ন ওঠে, ভাল কাজ করতে পারি কি না, আগে তা ঠিক হোক। যাঁরা শাস্ত্র মানেন, তাঁরা বলছেন, যেহেতু শাস্ত্র ভাল কাজ করতে বলছেন, তার দ্বারা বোঝায়, ইচ্ছা করলে তুমি ভাল কাজ করতে পারো। একটা গাছকে

কেউ বলে না 'সত্য কথা বল', বা একটা পাথরকে কেউ বলে না 'তীর্থ-দর্শন কর'—যেখানে সামর্থ্য না থাকে, সেখানে এই প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের ভিতরে সামর্থ্য আছে বলেই ধরে নেওয়া হয়। তুমি করতে পারো, না করতেও পারো বা এ-রকম না ক'রে অন্য রকম করতে পারো।

এই প্রশ্নটি মনকে বিব্রত করে যে, আমরা মনে করি আমরা স্বাধীন, এর মীমাংসা এখনো বুদ্ধির সাহায্যে হয়নি। একজন বলবে, 'আমার হাতটা তোলা বা নামানো আমার ইচ্ছায় হচ্ছে।' আরেকজন বলবে, 'ঐ হাতটা তোলা বা নামানোর কথা ছিল, তাই তুলছ বা নামাচ্ছ। ইচ্ছা ক'রে নামাচ্ছ বা তুলছ, তা তোমার অন্য দৃষ্টি নেই বলেই ব'লছ।' ঠাকুর সেই অন্য দৃষ্টির কথা বলছেন এখানে। "যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয়—আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন।" তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে, আমরা তাঁকে জানি না ব'লে মনে করি, আমরা স্বতন্ত্র। তাঁকে ক্রিয়ার পিছনে কর্তারূপে দেখি না বলেই আমাকে 'কর্তা' ভাবি। প্রশ্ন ওঠে, যদি স্বাধীন না হই, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি সব হয়, পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ আমি কেন ক'রব, তিনিই ভুগবেন। ঠাকুর বলছেন, "এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হ'লে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। পাপকে ভয় হ'ত না।" এই 'স্বাধীন ইচ্ছা'-বোধটি ঈশ্বর রেখে দিয়েছেন আমাদের মধ্যে, না হ'লে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। ভাল-মন্দ কর্মের ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে—এ-বোধ না থাকলে আমরা যা ইচ্ছে তাই করতাম, পরিণামে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। যখন ভগবান-লাভ হবে, তখন উপলব্ধি হবে—যা কিছু করছি, তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, প্রেরিত হ'য়ে যন্ত্ররূপে করছি। স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে কিছু নেই।

ঠাকুর বৈদ্যনাথকে বলছেন, 'তর্ক করা ভাল নয়।' তিনি সমর্থন ক'রে জানালেন, জ্ঞান হ'লে তর্কের ভাব চলে যায়। তর্ক করতে বারণ করছেন মানে, শুধু শুধু একজনের সঙ্গে বাদানুবাদ ক'রে নিজের

সিদ্ধান্তকে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা—সেই তর্কের কথাই বলছেন ঠাকুর। যে তর্কের দ্বারা, বিচারের দ্বারা সত্যকে জানবার চেষ্টা করা হয়, তার কথা বলছেন না।

ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে বলছেন, সত্যকে লাভ করতে হ'লে সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। "লোকে মনে করে—ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিক। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়?" ঠাকুর বলছেন: সত্যকে জানতে হ'লে, যাঁরা সত্যের জন্য জীবনপাত করেছেন, তাঁদের সঙ্গ করতে হয়। তাঁদের পথ অনুসরণ ক'রে চলতে হয়। সেখানে তর্ক ক'রে নয়, বিশেষ আগ্রহ ক'রে, শ্রদ্ধাসহকারে সত্যকে জানার পথ জানতে হয়।

কুড়ি

২।৪।৩-৪

৺অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে সংকীর্তন হবে, খোল বাজছে। গৌরাঙ্গের কথা হবে। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা শুরু হ'ল। পদাবলী-সাহিত্যে এই কথাটির একটু তাৎপর্য আছে, গানের পূর্বে চৈতন্যদেবের বন্দনা হয়। কীর্তন করবার আগে সমরসের শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক গান গাওয়া । কেন ওরূপ করা হয়? ভগবানকে জানতে হ'লে অবতারের মধ্য দিয়ে জানতে হয়; শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে হ'লে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখে তাঁর ভিতর দিয়ে বোঝা সহজ হয়। মানুষের ভিতর দিয়েই সেই লোকোত্তর পুরুষের চিন্তা সম্ভব। নরলীলার ভিতর দিয়ে যেতে হয় দিব্যলীলায়। পালাবদ্ধ কীর্তনের সাধারণ নিয়ম গৌরচন্দ্রিকার পর শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা, তারপর

মিলনে সমাপ্তি। বৈষ্ণব সাধক—যাঁরা গভীরভাবে এইসব সাধনা করেন, তাঁরা অনেকেই শুধু বিরহ শোনেন, মিলন শোনেন না। ভগবানের জন্য তীব্র বিরহ জাগানোর জন্য এটি তাঁদের সাধনা। এখানে প্রথানুযায়ী যুগলমিলনে কীর্তন সমাপ্ত হ'ল। ঠাকুর 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান' এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বারবার ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করছেন। ভগবানের কথা হয়েছে, তাই এ-স্থান পবিত্র।

নিরাকার-ভজন

রাত প্রায় সাড়ে নটা বাজে, ঠাকুর এবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন। মাতৃভক্ত সুরেন্দ্র—মায়ের পূজো হ'ল, মায়ের নাম হ'ল না ব'লে যেন মন খারাপ ক'রে বলছেন, 'আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হ'ল না।' ঠাকুর মনের সেই দুঃখ দূর করার জন্য বলছেন, "মা যেন আলো ক'রে ব'সে আছেন। এরূপ দর্শন করলে কত আনন্দ হয়।" তবে যারা এ-রূপকে না জেনে নিরাকার রূপের চিন্তা করে, তাদের কি হয় না, তা নয়। বলছেন এই যে, বিষয়বুদ্ধি একটুও থাকলে এই নিরাকার-দর্শন হবে না। ঋষিরা সর্বত্যাগী, তাঁরা অখণ্ডসচ্চিদানন্দ নিরাকারের সাধন করতে পেরেছিলেন। যাঁরা সেই ভাবে ভাবিত না হয়েও নিরাকার রূপে তাঁকে চিন্তা করতে চায়, ঠাকুর তাঁদের কথা বলছেন এখানে। "ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা 'অচল ঘন' ব'লে গান গায়—আমার আলুনি লাগে।" শব্দের পিছনে যিনি আছেন, তাঁকে গ্রহণ করতে না পেরে, তাঁকে অনুভব না ক'রে, শুধুমাত্র শব্দ প্রকাশ ক'রে কোন লাভ হয় না। "যারা নিরাকার নিরাকার ক'রে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাইরে, না আছে ভিতরে।" ঠাকুর এই কথা ব'লে মায়ের গান করছেন—"গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না"—"বলরে বল শ্রীদুর্গা নাম"—এইসব গানের পর তিনি আবার প্রতিমার সামনে প্রণাম

করলেন। সিঁড়িতে নামবার সময় বলছেন, ও রা, জু আ? অর্থাৎ ও রাখাল, জুতো সব আছে, না হারিয়ে গেছে? ঠাকুর যখন সমাধিতে থাকেন, তখন তাঁর দেহ ভুল হ'য়ে যায়। কিন্তু ব্যাবহারিক ভূমিতে যখন থাকতেন, কোন বিষয়ে অসতর্ক হতেন না। কারো অন্যমনস্ক ব্যবহার দেখলে ঠাকুর বিরক্ত হতেন। যে এক দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না, সে অন্যদিকেও পারে না। মনের উপর প্রভুত্ব নেই বলেই আমাদের ভুল হয়। মানুষের ব্যাবহারিক জীবন যেন সুশৃঙ্খল হয়, এটা তিনি চাইতেন। ব্যাবহারিক জীবন এলোমেলো হ'লে আধ্যাত্মিক জীবনও এলোমেলো হবে। সুশৃঙ্খল যার জীবন, সে যখন ভগবানের চিন্তা করবে, তার মন সে চিন্তা সুশৃঙ্খল ভাবেই করবে। ঠাকুর আমাদের মনকে সেইভাবে প্রস্তুত করার জন্য যেন এখানে আভাস দিচ্ছেন। ঠাকুরের দৃষ্টি সতর্ক ছিল ব্যাবহারিক ভূমিতে, আবার যখন তিনি আধ্যাত্মিক গভীরতায় মগ্ন, তখন কোন হুঁশ নেই—এইটি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

একুশ

২।৫।১

বলরামের বাড়ী গিয়েছিলেন ঠাকুর, সেখান থেকে অধরের বাড়ী হ'য়ে রামদত্তের বাড়ী এসেছেন; রাম ঠাকুরকে শ্রীমদ্‌ভাগবত শোনাবেন। ভাগবত পাঠ হচ্ছে—রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা কথকঠাকুর বর্ণনা করছেন। হরিশ্চন্দ্রের করুণ কাহিনী শুনে শ্রোতাদের চক্ষে জল। তারা হাহাকার ক'রে কাঁদছেন। করুণ রসের অনুভব খুব দ্রুত হয়। ঠাকুর কি করছেন? তিনি স্থির হ'য়ে শুনছেন, চোখের কোণে একবিন্দু জল

দেখা গেল তা মুছে ফেললেন। অস্থির হ'য়ে কেন হাহাকার করলেন না—অপর সকলের মতো? যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, দুঃখে তিনি অনুদ্বিগ্ন, গম্ভীর, শান্ত। তা ব'লে ঠাকুর যে লোকের দুঃখে সহানুভূতি জানাতেন না, তা নয়। যখন যে ভাবের অবস্থায় তিনি থাকেন, তাঁর সেইরকম অভিব্যক্তি হয়।

উদ্ধবসংবাদ ও প্রেমাভক্তি

ঠাকুর কথকঠাকুরকে বললেন 'কিছু উদ্ধব-সংবাদ বলো।' হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর করুণাধারাকে একটু ফিরিয়ে দেবার জন্যই যেন ঠাকুর উদ্ধব-সংবাদ বলতে বললেন। প্রত্যেক কাব্য বা কথার ভিতর একটা স্থায়ী ভাব আছে যা আমাদের মনকে নাড়া দেয়। উদ্ধব-সংবাদে গোপীরা এসে উদ্ধবকে বৃন্দাবন-লীলার ব্যাখ্যা করছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের ব্যাকুলতা তিনি দেখছেন। তিনি বলছেন, "আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হচ্ছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন।" গোপীরা বলছেন, "আমরা আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি।" উদ্ধব জ্ঞানী, তিনি গোপীদের বোঝাচ্ছেন তাঁর জ্ঞানের সাহায্যে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করলে মুক্তি হ'য়ে যায়। গোপীদের প্রেমাভক্তি, বলছেন, "মুক্তি—এ-সব কথা আমরা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখতে চাই।" উদ্ধব জ্ঞানী, গোপীদের এই মনোভাব, ভগবানের সান্নিধ্য লাভের জন্য এই ব্যাকুলতা, তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। ধ্যানগম্য ভগবান, তাঁকে চিন্তা করলে সংসার-সাগর পার হওয়া যাবে, নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে; এরা মুক্তি লাভ করতে চায় না, এ-কথাটি তিনি বুঝতে পারছেন না। যে মুক্তি সাধকের কাম্য, গোপীরা তা চায় না। মুক্তি তাদের কাছে তুচ্ছ, দিলেও তারা নেবে না।

ভাগবতে আছে :—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (৩।২৯।১৩)

অর্থাৎ প্রকৃত ভক্ত বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি দিলেও গ্রহণ করবেন না। যদি তাঁর সেবার সুযোগ হয়, তা হ'লে মুক্তি নিতে চান। অর্থাৎ মুক্তি তাঁদের লক্ষ্য নয়, একটা উপায় মাত্র, যাতে ভগবানের কাছে থেকে সর্বদা তাঁর সেবা করতে পারেন। জ্ঞানীর মুক্তিতে ভক্ত ভগবানে লীন হ'য়ে যান, কোনও পার্থক্য থাকে না সেখানে। সেই মুক্তি ভক্ত চান না। ঠাকুর গোপীদের ভাব বোঝাবার জন্য গান গাইছেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,

শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো॥—

ঠাকুর বলেছেন, "গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি।" যে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান মিশ্রিত রয়েছে, তা হ'ল ব্যভিচারিণী ভক্তি। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি কি রকম? তিনিই সব হয়েছেন—রাম, কৃষ্ণ, শিব—এইটি হ'ল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। প্রেমাভক্তিতে ঐ জ্ঞানটুকু মেশানো নেই। হনুমানের দৃষ্টান্ত দিলেন ঠাকুর। দ্বারকায় এসেও হনুমান কৃষ্ণের কাছে রাম-রূপে দর্শন চাইলেন। বিভীষণের দৃষ্টান্ত দিলেন, রাজসূয় যজ্ঞের সময় সব রাজারা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করছেন, বিভীষণ করবেন না। রামের পায়ে তাঁর মাথা নত করেছেন, আর কাকেও প্রণাম করবেন না। কৃষ্ণ নিজে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করতে, তখন বিভীষণ রাজাকে প্রণাম করলেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, বাড়ীর বৌ সকলেরই সেবা করে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তার অন্য সম্বন্ধ। এই রকম নিষ্ঠার সঙ্গে যে ভক্তি, তা হ'ল গোপীদের।

ঠাকুর প্রেমাভক্তির দুটি লক্ষণ বলছেন,—অহংতা আর মমতা। অহংতা—অর্থাৎ আমি তাকে দেখব, তার সেবা ক'রব। আমি তাকে না

দেখলে তাকে কে দেখবে, তার অসুখ হবে—এই ভাব। যশোদার এই ভাব ছিল। শ্রীরাধারও ভাব তাই। শ্রীকৃষ্ণ যে চন্দ্রাবলীর কাছে যান, তাতে রাধারানী ভাবেন, সে তো সেবা জানে না, কৃষ্ণের কষ্ট হবে, এই ভাব রাধার। মমতা হ'ল, 'তিনি আমার' এই বুদ্ধি। 'আমার' গোপাল, 'আমার'-জ্ঞান। উদ্ধব গেছেন যশোদার কাছে, বলছেন, 'কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি।' মা যশোদা বলছেন, 'চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে?' 'আমার গোপাল' এই বুদ্ধি, এই ভাব হ'ল 'মমতা'। গোপীদের ভাব আলাদা। "দ্বারকায় লোকেরা রাধাকে পূজো করে না কৃষ্ণের সঙ্গে। অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজো করে।"—ঠাকুর বলছেন, "তারা রাধা চায় না।" দাক্ষিণাত্যেও রাধার কথা নেই। ভাগবতে রাধা-নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভগবান যে রাসলীলা করেছেন গোপীদের সঙ্গে, সেখানে একজন প্রধানা গোপীর বর্ণনা আছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অন্য গোপীদের থেকে দূরে গিয়ে বিহার করছেন। বৈষ্ণবগণ তাঁকেই রাধারূপে কল্পনা করেছেন। রাধা কেন?

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। ভাগবত ১০।৩০।২৮

ইনি নিশ্চয়ই সেই ভগবান হরিকে ভজনা করেছেন, তাই একে নিয়ে ভগবান বিহার করছেন আমাদের থেকে দূরে গিয়ে। 'রাধা' শব্দটি 'অনয়ারাধিত' থেকে এসেছে। স্পষ্টভাবে রাধার উল্লেখ নেই, ইঙ্গিতে করা আছে। রাধাকে সকলে পূজো করে না। রাধা বৃন্দাবনের ভাব, এই ভাবের প্রতিচ্ছবি শ্রীচৈতন্যের মধ্যে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে রাধাভাবটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট, বাংলা থেকে উড়িষ্যা ও আসামেও কিছু এই রাধা-ভাব প্রচারিত হয়েছে।

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ও প্রেমাভক্তির মধ্যে কোনটি ভাল? ঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না এলে প্রেমাভক্তি হয় না। আর

'আমার' জ্ঞান।" ভগবানের প্রতি প্রেম হয়েছে, তাঁকে খুব আপনার ব'লে বোধ হয়েছে, এইটি চাই। এত ভালবাসা হয়েছে যে তাঁকে আর ঐশ্বর্যশালী ব'লে বোধ হয় না। খুব বেশী ভালবাসা এলে প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে হয়। কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হ'ল। ভগবান বসুদেব ও দেবকীকে চতুর্ভুজ-রূপে দেখা দিলেন। দেবকী ভয় পাচ্ছেন এই ভেবে, এই রূপ দেখলে কংস তাকে মেরে ফেলবে। ভগবান তাঁর ভগবান-রূপে দেখা দিলেন, দেবকী দেখছেন সন্তান-রূপে; মায়ের মন, তাই ভয় পাচ্ছেন অমঙ্গল-আশঙ্কায়। যিনি সর্ব-ঐশ্বর্য-সম্পন্ন, যাঁর ইচ্ছায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলছে, সেখানে কংস কি ক'রে তাঁকে মারবে, এ-কথা মনে হ'ল না। খুব ভালবাসা এলে এটি হয়। ভগবান যদি গোপীদের সামনে সর্বদা বিশ্বনিয়ন্তা-রূপে দেখা দেন, তা হলেও তাঁরা দেখতে চান না। ভগবানের ভগবত্তা তাঁরা দেখতে চান না। তাঁর ঐশ্বর্য ভক্তকে প্রলোভিত করে না, তাঁর কাছ থেকে তারা কিছু চায় না, এইটি প্রেমা-ভক্তির লক্ষণ।

বাইশ

২।৬।১-২

ফলহারিণী কালীপূজা

আজ অমাবস্যা ও ফলহারিণী কালীপূজা। মাস্টারমশায় ফলহারিণী কালীপূজার দিন ঠাকুরের অবস্থার বর্ণনা করেছেন। আমরা কথামৃতের ভিতর বারবার দেখেছি—বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিশেষ বিশেষ দিনে ঠাকুরের মন ভাবে পূর্ণ হ'য়ে থাকত। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হ'য়ে গান করছেন—"তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি সে পাতাল" আগের দিন

রাত্রিবেলায় কাত্যায়নী পূজা হয়েছে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য কাত্যায়নী পূজা করেছেন। কাত্যায়নীদেবী শক্তি, শক্তির কৃপা হ'লে ভগবান লাভ হয়।

ফলহারিণী পূজার দিন ঠাকুর ভাবে গর্গর। ঠাকুর রাখালকে সাক্ষাৎ গোপালভাবে দেখেছেন; পূজা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বাবুরা সব বাগানে এসেছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাগা, কাল যাত্রা হয় নাই ?" ত্রৈলোক্য উত্তরে জানালেন, এবারে অসুবিধে ছিল, তাই হয়নি। তখন ঠাকুর বলছেন, "তা এইবার যা হয়েছে তা হয়েছে, দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়। যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হওয়া ভাল।" রানী রাসমণি বিপুল সম্পত্তি দিয়ে গেছেন দেবসেবার জন্য, যে উদ্দেশ্যে এই দান, তা যেন সার্থক হয়—ঠাকুর তাই দেখছেন। যাত্রা হওয়া না হওয়ার জন্য কিছু নয়, দাত্রীর ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়, এজন্য বলছেন। ঠাকুর তাঁদের কল্যাণ-চিন্তা ক'রে এই কথা বলছেন। রানী রাসমণি জীবিত নেই, তবুও তাঁর সেই সম্পত্তি যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যয়িত হয়, ঠাকুর তা দেখছেন,—কত ভাবে তিনি কল্যাণ-চিন্তা করছেন তাঁদের।

ঠাকুরের আচরণ ও উদ্দেশ্য

ঠাকুরের ব্যবহার অনেক সময় বুঝতে পারা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ব্যবহার খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়। তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে, লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন—ঠাকুরের প্রত্যেকটি কাজ, ব্যবহার সমস্ত গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যদি দয়া ক'রে বোঝান, তা হ'লে বোঝা যায়। অবতারের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা লোককল্যাণের জন্য। তাঁদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস জগতের কল্যাণের জন্য। তাঁর কোন কাজ, কোন চেষ্টা, কোন ব্যবহার বৃথা

নয়। লীলাপ্রসঙ্গে আছে, একদিন ঠাকুর বলরামবাবুকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করছেন, "আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হ'ল বলো দেখি?" বলরামবাবু চুপ ক'রে আছেন। ঠাকুর নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, "এর জন্য হয়েছে। নইলে কে আর এমন ক'রে রেঁধে দিত বলো?" আবার, একদিন বলছেন বিয়ের প্রসঙ্গে—"ব্রাহ্মণ-শরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিবাহ তারই মধ্যে একটা।" আবার কখন কখন বলতেন, "যে পরমহংস হয়, সে হাড়ী-মেথরের অবস্থা থেকে রাজা-মহারাজা, সম্রাটের অবস্থা পর্যন্ত সব ভোগ ক'রে দেখে এসেছে।" লীলাপ্রসঙ্গকার এখানে বলছেন—সাধারণ গুরুদের বিবাহ করবার ঐ-রকম কারণ নির্দেশ করলেও ঠাকুরের বিবাহের বিশেষ কারণ আছে। ত্যাগের জীবন তিনি দেখালেন। বিবাহিত জীবনের উচ্চ পবিত্র আদর্শ রেখে গেছেন—আমাদের শিক্ষার জন্য। তিনি বিবাহ না করলে একজন সাধারণ সন্ন্যাসীর পর্যায়ে পড়তেন। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ত্যাগময় জীবন বরণ করতে পারেন, তাঁরাই ঠাকুরের আদর্শ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কি হ'ত? সাধারণ মানুষ ঐ আদর্শ নিতে পারত না। ভাবত, 'তিনি তো বিয়ে করেননি, তাই অত ব্রহ্মচর্যের কথা বলছেন।' ঠাকুরের আগমন কেবল কয়েকজন মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসীর জন্য নয়, তাঁর আসা সকলের জন্য। সংসারে থেকে সংসারে না জড়িয়ে পড়ে সংসার করেছেন; তাঁরই ভাষায় বলি, পাঁকাল মাছের মতো। সকলের জন্য এই রকম পরিপূর্ণ আদর্শ কখনো দেখা যায়নি।

ভাগবতে বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ ক'রে আসছেন সকলে তাঁকে নিজের ভাবে দেখছেন। রাখালেরা সখারূপে, যশোদা গোপালরূপে, গোপীরা প্রিয়তমরূপে—নিজের নিজের দৃষ্টিতে দেখছেন। এ দেখা আংশিক হ'ল। বিভিন্নক্ষেত্রে মানবরূপে যে প্রকাশ, তা তেমন ভাবে ব্যক্ত হয়নি। সমস্ত ক্ষেত্রে নিজের জীবন যাপনের মাধ্যমে তাঁর

সাধনাকে অব্যাহত রাখা যায় এবং এই আদর্শ অনুসরণ ক'রে সাধারণ মানুষও তার সাধনা অব্যাহত রাখতে পারে—সেই আদর্শ ঠাকুর যেমন ভাবে দেখিয়ে গেছেন, সে-ভাবে আর কখন চিত্রিত হয়নি। ঠাকুরের প্রতিটি কথাই গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ—এ-কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

ঠাকুর বলছেন, "হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো? মা দেখালে তিনিই মানুষ' হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন।" ঠাকুর ছেলেদের নিয়ে আনন্দ করতেন। তাদের জন্য ব্যাকুল হতেন। নরেন্দ্রকে দেখবার জন্য তাঁর প্রাণ আঁকুপাঁকু ক'রত। ঠাকুর ভাবছেন, কেন এমন হ'ল। ঠাকুর-বাড়ীর মুহুরী ছিলেন ভোলানাথ, তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "কেন এমন হচ্ছে?" উত্তরে ভোলানাথ বললেন, 'মহাভারতে আছে সমাধিস্থ পুরুষের মন যখন নামে, তখন সত্ত্বগুণী মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে'। বাহ্যজগতে যখন তাঁদের মন থাকে, তখন শুদ্ধ আধারসম্পন্ন কারো আকর্ষণে মন নামিয়ে রাখেন। এই জন্য সত্ত্বগুণী বালকদের প্রতি তাঁর মনের আকর্ষণ।

ঠাকুর পূর্বকথা বলছেন। তাঁর প্রেমোন্মাদ অবস্থার কথা বলছেন। সেই উন্মাদনা দেখে সকলে ভাবলো, পাগল হয়েছে তাই বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল। যাতে ঘরে মন আসে, সংসারী হয়, তাই ঠাকুরের বিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা ঠাকুরের জীবন-চরিতের মধ্যে দেখেছি—সে মন এমন ভাবে তৈরী, যা সংসারে কিছুতে লিপ্ত হয়নি।

ঠাকুর তাঁর সাধনাবস্থার কথা বলছেন, তখন একটুতেই উদ্দীপন হ'ত। বেশ্যাকে দেখে সীতার উদ্দীপন। গড়ের মাঠে একটি সাহেবের ছেলে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে গাছে হেলান দিয়ে আছে—দেখেই শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁর মনে এলো। শিহড়ে রাখাল-ভোজন করাচ্ছেন, দেখলেন যেন সাক্ষাৎ ব্রজবালক। প্রত্যেক কাজে সেই ভগবদ্ভাবের আভাস লেগে

রয়েছে। কোন একটি অতি সাধারণ ঘটনা, কি তুচ্ছ দৃশ্য—তাতেও সেই ভাব ঘনীভূত হ'য়ে উঠত। সেই সময় তাঁর প্রায় হুঁশ থাকত না। জানবাজারের বাড়ীতে মথুরবাবু ঠাকুরকে নিয়ে কিছুদিন রাখেন। তিনি সেখানে অন্দর মহলে থাকতেন, একটুও লজ্জা বোধ হ'ত না। যেন তাদেরই একজন তিনি, এই রকম মনে হ'ত। সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছেন—এই ভাব মনে থাকত। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিনি অবস্থান করেছেন। সব সময় একই ভাবে থাকতেন না, ভক্তেরা কেবল তাঁর একটি রূপ দেখে মনে না করেন—তিনি এই মাত্র, অন্য কিছু নন। তিনি যে সর্ব-দেবদেবী-স্বরূপ এ-কথাটি মনে না রাখলে পরিপূর্ণভাবে ঠাকুরকে গ্রহণ করতে পারা যাবে না।

ঠাকুরের জীবনের এই দৃষ্টান্ত—মেয়েদের সঙ্গে অন্দর মহলে তিনি বাস করছেন, তাঁদের সঙ্গে মিশে গেছেন—আমরা কি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রব আমাদের জীবনে? না, ঠাকুর তা বলেন নি। স্ত্রীলোকদের থেকে পুরুষদের সাবধান থাকতে বলছেন। এই সাবধান-বাণী স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। কাউকেও ঘৃণা ক'রে বা ছোট ক'রে এ-কথা বলা হয়নি। প্রত্যেকেই যাতে নিজের ভাবে অচঞ্চল থেকে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে সেই জন্য বলছেন। এই মেলামেশায় চাঞ্চল্য আসে, তাই এত সতর্কতা। ঠাকুর জানবাজারে ছিলেন যখন, মথুরবাবুর বাড়ীতে তিনি যেভাবে মিশেছেন, মনের কত শুদ্ধি হ'লে এভাবে থাকা যায়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না! পুরাণে একমাত্র শুকদেবের কথা আছে, যাঁর ভিতরে এতটুকু দেহবুদ্ধি নেই। শুকদেবকে দেখে স্নানরতা অপ্সরারা একটুও লজ্জা পায়নি। একটা গাছ দেখে যেমন লজ্জা করে না, একটি ছোট শিশু দেখলে যেমন লজ্জাবোধ হয় না, সেইরকম এঁকে দেখেও তাদের লজ্জা হয়নি। মেয়েরা বলছেন, ঠাকুরকে মনে হ'ত আমাদেরই একজন।

তেইশ

২।৬।৩

হাজরা, ভবনাথ ইত্যাদি

দুপুরে খাবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করছেন, ঠিক গাঢ় ঘুম নয়, তন্দ্রার মতো অবস্থা। গাঢ় নিদ্রা ঠাকুরের প্রায় হ'তই না, এই রকম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েই থাকতেন, তাতেই তাঁর বিশ্রাম হ'য়ে যেত। ঠাকুর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই মণি মল্লিকের সঙ্গে দু-একটি ক'রে কথা বলছেন। মণিলাল বলছেন যে, শিবনাথ নিত্যগোপালের খুব সুখ্যাতি করেন। বলেন বেশ অবস্থা। ঠাকুর প্রশ্ন করছেন যে, হাজরাকে ওরা কি বলে। মনে হ'তে পারে ঠাকুর অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এ-প্রশ্নটি কেন করলেন? বাইরের অবস্থা দেখে একজনের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাপ করা খুব কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে খুব উন্নত ব'লে মনে হয়, হয়তো সেই-রকম উন্নতি তার হয়নি। অথবা যাকে আমরা উন্নত ব'লে মনে করি না, তার মধ্যেও হয়তো উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ঠাকুর তাই নিত্যগোপালের সম্বন্ধে কথা উঠতে হাজরার কথা বললেন। হাজরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছেই থাকতেন। খুব জপ-ধ্যান করতেন, বাহ্যাড়ম্বর খুব বেশী ছিল, ভক্তদের অনেকেই হাজরার প্রতি আকৃষ্ট হন। ঠাকুর অনেক সময় উপহাস ক'রে বলতেন, "এখানে যদি বড় দরগা হয় তো ওখানে ছোট দরগা।" অর্থাৎ হাজরাও কম নয়।

ঠাকুর এবার উঠে বসলেন, ভবনাথের কথা বলছেন, "আহা তার কি ভাব! গান না করতে করতে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে।" ভবনাথ সংসারী, কিন্তু

ভগবানের নাম করতে গেলেই চোখে জল আসে, হরিশ ঠাকুরের কাছে থাকে, তাই হরিশকে দেখেই ভাব হ'য়ে গেল। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি যে তাঁর একটি পিপাসা আছে, এটা বেশ বোঝা যায়, ঠাকুর এই ব্যাকুলতার প্রশংসা করছেন। এদের এই ভক্তির কারণ কি, তিনি মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে নিজেই উত্তর দিচ্ছেন। "মানুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর। যেমন পুলির ভিতর কলায়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে একরকম। ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি এরই নাম ক্ষীরের পোর।" পিঠের ভিতর কি আছে না আছে, বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না ; সেই রকম মানুষও বাইরে থেকে দেখতে একরকম, কিছু বোঝা যায় না ভিতরে কি আছে। যেন পূর্বপ্রসঙ্গের জের টেনে কথাটি বলছেন যে কারো প্রশংসা যখন করা হয়, তখন কি অন্তরটা দেখে তা করা হয়? বাহ্য আবরণ, বাহ্য ব্যবহার দেখে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল ; কিন্তু সত্য সত্য মানুষটি কি রকম, তা বুঝবেন যাঁরা অন্তর্দ্রষ্টা, তাঁরা ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারবে না। এই ক্ষীরের পোর যার ভিতর রয়েছে অর্থাৎ প্রেমভক্তি যার মধ্যে আছে, অনুকূল অবস্থা পেলে সেই প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে বাইরে তার প্রকাশ হয়। সেই ভাব প্রকাশ হবার পূর্বেও যিনি অন্তর্দ্রষ্টা তিনিই দেখতে পান।

গুরুকৃপা ও শিষ্য-প্রচেষ্টা

ভক্তদের অভয় দিচ্ছেন ঠাকুর, "কেউ কেউ মনে করেন, আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হ'লে কিছুই ভয় নাই।" এই আশঙ্কা অনেকেরই মনে ওঠে। বিশেষ ক'রে সাধনের প্রারম্ভে নিজের মনের সঙ্গে যখন পরিচয় হ'তে আরম্ভ হয় ;

তখন তার বিষয়াসক্ত মন দেখে নিজেকে বদ্ধজীব ব'লে মনে হয়। ঠাকুরের অভয়বাণী 'গুরুর কৃপা হ'লে কিছু ভয় নেই,'—গুরুর কৃপায় জীব সেই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির পথে যাবে। জীবের ভিতর যে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে, সেইটি গুরু তার কাছে প্রকাশ করবেন এবং তাকে প্রেরণা দেবেন, কিভাবে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা যায়। গুরুর কৃপা বোঝাবার জন্য ঠাকুর একটি গল্প বলেছেন এখানে।

একটি ব্যাঘ্র-শিশু ছাগলের পালের মধ্যে থেকে বড় হ'তে থাকে। ছাগলের সঙ্গে থাকার জন্য তার ব্যবহারও ছাগলের মতোই হ'ল। আর একটি বাঘ তাকে ছাগলের পালে দেখে অবাক্ হ'য়ে জোর ক'রে তাকে ধরে জলের কাছে নিয়ে গিয়ে তার প্রতিবিম্ব দেখালে, জোর ক'রে তাকে মাংস খাওয়ালে। বাঘটি বুঝল, 'আমি আর ছাগলের মতো অসহায় নই, আমি বাঘ।' এই নতুন বাঘটি হ'ল ছাগলের পালে বড় হওয়া ঐ বাঘের গুরু। তাই গুরুকৃপা হ'লে কোন ভয় থাকে না। গুরু-কৃপায় বদ্ধজীব জানতে পারে তার স্বরূপ, তখন সে বন্ধন ছিঁড়ে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই নাম স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আমরা ভুলে গিয়েছি। গুরু এসে শেখান—এই রকম অসহায় অষ্টপাশে আবদ্ধ মানুষ তুমি নও; তোমার ভিতরে রয়েছেন পরমপুরুষ, তাঁর পরিচয় তোমায় পেতেই হবে। তুমিই সেই সর্ব-বন্ধন-মুক্ত পরমাত্মা। স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যে ঠাকুরের এই বাঘ ও ছাগলের গল্পটি ব'লে আত্মার মহিমার কথা বলেছেন অনেক বক্তৃতায়।

গুরু দিক্ নির্দেশ ক'রে দেন, কিন্তু সাধককে সেই পথে চলতে হবে। গুরু তাকে ধ'রে সেই পথে পৌঁছে দেবেন, এ-সব কথা কল্পনা করা উচিত নয়। এইজন্যে আমরা দেখতে পাই, সাধুসঙ্গে কেউ লাভবান্ হয়, আবার কেউ লাভবান্ হয় না। সাধুসঙ্গ হ'ল ঠিকই, কিন্তু সাধকের নিজের উত্তম না থাকায় সাধুসঙ্গের ফললাভ হয় না। প্রচলিত একটা

কথা আছেঃ গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ'ল, একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।—গুরু অর্থাৎ যিনি পথের নির্দেশ দেবেন, কৃষ্ণ হলেন শ্রীভগবান, যিনি গন্তব্যস্থল, আর বৈষ্ণব অর্থাৎ সাধক, এই তিনজনের দয়া হ'ল অর্থাৎ সাধক ঠিক করলে সাধনা ক'রে সে ঈশ্বরলাভ করবে। কিন্তু একের দয়া হ'ল না—মনের দয়া না হ'লে, তার চেষ্টা না থাকলে সে ঈশ্বরলাভ করতে পারবে না।

আমরা অনেক সময় শুনি, "গুরুকৃপা হ'লে হবে, তাছাড়া হবে না।" নিজেরা কিছু করতে চাই না, বলি—তিনি করান তো হবে। এটা নির্ভরতা নয়, আলস্য। নিজের মনের সঙ্গে এইভাবে কপটতা করি। যদি তত্ত্ব সম্বন্ধে গুরুর নির্দেশ শুনেও মন সে দিকে যেতে চেষ্টা না করে, তা হ'লে গুরুর প্রয়োজন কি? তুমি যদি নিজে চেষ্টা না কর তো তোমায় কে চেতন করবে? ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙানো যায় না। যে চেষ্টা করে না, তার 'মনের দয়া' হয় না। যিনি ঠিক ঠিক গুরু, তিনি শিষ্যকে স্বাবলম্বী করেন। তাকে জানিয়ে দেন—তোমাকে নিজের উপর নির্ভর করতে হবে। গীতায় ভগবান বলেছেনঃ

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ (৬।৫)

—বিবেকযুক্ত মন দিয়ে মানুষ আপনিই আপনাকে উদ্ধার করবে, আত্মাকে অধোগামী করবে না। শুদ্ধমন জীবের বন্ধু, মুক্তির সহায়ক। বিষয়াসক্ত মন জীবের শত্রু। সুতরাং আমাদের অপরের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে থাকতে হবে—এ-কথা শাস্ত্র কখনো বলেন না। এমন কি গুরুর উপরেও না। গুরু পথ নির্দেশ করবেন, পথের বিপদ কি ক'রে অপসারণ করা যায়, তা ব'লে দেবেন, কিন্তু চলার কাজ শিষ্যকে করতে হবে। আমার করার কিছু নেই, তিনিই করাচ্ছেন—এই কথাটি যখন আমার

কর্তৃত্ববোধ লোপ পেয়ে যায়. একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, তখনই বলা যাবে, তার আগে নয়। যতক্ষণ ভিতরে আমি গজগজ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'তিনিই করছেন' বলা কপটতা। সুতরাং এই কপটতা পরিত্যাগ ক'রে তিনি যে পথ নির্দেশ করেছেন, সেই পথে চলতে হবে যথাযথ ভাবে। ঠাকুরের এই কথাটি 'গুরুর কৃপা হ'লে আর কোন ভয় নাই'—ভালভাবে বুঝতে হবে। যেন নিজের সঙ্গে জুয়াচুরি একটুও না হয়। গুরু জানিয়ে দেবেন প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু আমরা কি জানতে চাইব? গুরুর কৃপা নেবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? একটু সাধন করলেই তিনি বুঝিয়ে দেন এই পথ। তখন শিষ্য নিজেই বুঝতে পারে—ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য। এই সাধনটুকু শিষ্যকে করতে হবে, না হ'লে সে গুরুকৃপা বুঝবে কি ক'রে?

আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলি: যখন গুরুদেবকে প্রশ্ন করেছি, তিনি ধমক দিতেন, "এই ভাবে খেতে-শুতে এ-রকম সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়?" তারপরেই মিষ্টি ক'রে বলছেন, "বাবা, আমরা কি চিরকাল থাকব? সব সময় যদি আমার উপর নির্ভর ক'রে থাকো, তা হ'লে নিজের পায়ে কখনও দাঁড়াতে পারবে না। যা প্রশ্ন উঠবে, তার উত্তর তোমাকে নিজের ভিতর থেকে পেতে হবে।'—এই কথাগুলি অনুধাবন করবার। শিষ্যকে স্বনির্ভর হ'তে গুরু সাহায্য করবেন।

একটু সাধন করলেই মানুষ বোঝে কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ। দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন কপট সাধন ক'রে এক মাছ-চোর জেলের মনে বৈরাগ্য এসেছিল। মাছ চুরি ক'রে ধরা পড়ার ভয়ে সাধুর সাজে গাছতলায় বসে থাকে। সাধু দেখে অনেকে ভক্তি ক'রে প্রণাম ক'রে গেল। তার মনে বৈরাগ্য এল, কপট সাধনাতেই এই অবস্থা, তা হ'লে সত্যি ভগবানকে ডাকলে তাঁকে পাব। তখন বোধ হবে, ঈশ্বর একমাত্র সত্য, সংসার অনিত্য, দু-দিনের জন্য।

ঠাকুর যাদের কাছে বলছেন, সংসার অনিত্য, তারা সকলেই সংসারে আবদ্ধ। সংসারের অনিত্যত্বের কথা শুনে এক ভক্তের মনে প্রশ্ন এসেছে, যারা সংসারে আছে তা হ'লে তাদের কি হবে? সংসার কি ত্যাগ করতে হবে? মনের মধ্যে এই ভাবনা চলেছে, অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর তাদের ভয় বুঝতে পারছেন। বলছেন, যদি কেরানীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরানীগিরি জুটিয়ে নেয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হ'য়ে থাকা যায়।"

জ্ঞানী ও সংসার

যদি কেউ ভগবৎকৃপায় মুক্ত হ'য়ে যায়, তার সংসার অনিত্য, অসার ব'লে বোধ হয়, ঈশ্বরকে সত্য ব'লে মনে হয়। এই জ্ঞান নিয়ে সে সংসার করুক, তাতে কোন দোষ হয় না। সংসার যে ত্যাগ করতেই হবে, তা নয়। সংসারে আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। আসক্তি ত্যাগ ক'রে সংসার করলে দোষ নেই, গুরুকৃপায় এইভাবে জীবন্মুক্ত হ'য়ে সংসারে থাকা যায়। জনক রাজার বা ধর্মব্যাধের গল্পের পতিসেবা-পরায়ণা মহিলার কথা বলা যায় জীবন্মুক্তি-প্রসঙ্গে। তাঁরা সেইভাবে সংসারে ছিলেন। জ্ঞান লাভ ক'রে আসক্তিশূন্য হ'য়ে সংসার করে-ছিলেন।

আসল কথা হ'ল দৃষ্টি; যে দৃষ্টি দিয়ে দেখব, সেই অনুসারে বদ্ধ বা মুক্ত হবো। সংসারকে যদি ছায়ার মতো মনে করি, সে সংসার আর আসক্তির কারণ হবে না। সংসার যেমন আছে তেমনই থাকবে, শুধু দৃষ্টিকোণ পাল্টাতে হবে। বদ্ধজীব যেমন খায় ঘুমোয়, জ্ঞানীও সেই রকম ব্যবহার করেন। একজন জগৎ সত্য দেখেন, অপরজন জগৎ মিথ্যা

দেখেন। আসক্ত হ'য়ে কাজ করে বদ্ধজীব, জ্ঞানী অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করেন, ফলে আরো ভালভাবে কাজ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে—জ্ঞানীর ব্যবহার কখন দূষণীয় হয় না; কারণ, আসক্তি না থাকায় তাঁর ব্যবহারে দোষ থাকে না। আসক্তি থেকে দোষ আসে। জ্ঞানীর পা কখনও বেচালে পড়ে না।

ঠাকুর সংসারীদের অভয় দিচ্ছেন। সংসার যে ছাড়তে হবে, এমন কথা নয়। সংসারে অনাসক্ত হ'তে হবে। সংসারে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে। সংসারে যে সত্যত্ব-বোধ রয়েছে, তার ভিতর ভগবান রয়েছেন, এই জন্যেই সেই সত্যত্ব-বুদ্ধি—এই কথা আমাদের বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে। এ-সংসার যা দেখছি, সবই তিনি—এই ভেবে কাজ করা। তিনি জগতের সর্বত্র রয়েছেন, এ যদি জানা যায়, তা হ'লে আর ভয় নেই, ঈশ্বর-তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত জগৎটাকে ঢাকতে হবে। তিনিই সার, এই বোধ থাকলে সংসারে আসক্তি হবে না।